শিখ রাস্তার দিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে আমরা হাবিলদারের কথা জিজ্ঞাসা করায় বারিকের একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে সেইদিকে যাইতে বলিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। আমরা মনে করিলাম বোধ হয় বাহিরের লোকও অনায়াসেই বারিকের মধ্যে যাইতে পারেন। কিন্তু তবুও বারিকের কাহারও সহিত কোনরূপ পরিচয় না থাকায় সেদিন বারিকে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। দেশী ও ইংরাজ সৈন্যের কতক খবর লইয়া সেদিন সহরের দিকে ফিরিলাম। কাশীতে শিখ সৈন্য আছে দেখিয়া সেদিন কত উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম, কারণ পাঞ্জাবে গিয়া দেখিয়াছিলাম শিখদিগকে অতি সহজেই উত্তেজিত করিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া ভাবিলাম যদি এই শিখদল আরও কিছুদিন এখানে থাকে ত পাঞ্জাব হইতে শিখ নেতাদিগকে এইখানে আনিয়া অতি সহজেই কার্য্যোদ্ধার করা যাইবে। সেদিন আমি কেবল এইটুকু কামনা করিয়াছিলাম যে এই শিখদল যেন আরও কিছুদিন এখানে থাকে। এই সময় কোনও সৈনিকদল বেশীদিন একস্থানে থাকিত না। এই দলও অল্পদিনের মধ্যেই বহুস্থান ঘুরিয়া আসিয়াছিল এবং কবে যে পুনরায় ইহারা এখান হইতে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবেন তাহারও কিছু স্থিরতা ছিল না।

এদিকে ৬ই ডিসেম্বর আসিয়া পড়িল। যথা সময় ষ্টেসনে গেলাম। হু হু করিয়া পাঞ্জাব মেল ষ্টেসনের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। মনে হইল আমাদের বিপ্লবায়োজনের সহিত আমাদের ইঞ্জিনের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাই তার প্রচণ্ড বেগ দেখিয়া মনে হইল যেন পাঞ্জাবের বিপ্লববার্ত্তা বহন করিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, এখনই পাঞ্জাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে দেখিতে এই প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু গাড়ীতে পৃথ্বী সিংএর দেখা পাইলাম না। কত খুঁজিলাম কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্জাবীদের উপর বড় রাগ হইল, ভাবিলাম পাঞ্জাবীদের মোটে কাণ্ডজ্ঞান নাই। এখন কি করা যাইবে। উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা ত সোজা নহে। দাদাকে গিয়া সব কথা বলিলাম। ভাবা গেল হয়ত কোনও কারণে পৃথ্বীসিং ওই তারিখে আসিয়া পঁহুছাইতে পারেন নাই, সেই জন্য পরের দিন আবার ষ্টেসনে গেলাম, সেদিনও দেখা পাইলাম না। তার পরের দিন গিয়াও দেখা পাইলাম না।

দাদার পরামর্শে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাঙ্গলাদেশে চলিয়া গেলাম।

যদিও বলিতেগেলে দাদাই সারা উত্তর ভারতের প্রকৃত নেতা ছিলেন তথাপি দলের পূর্ব্বানুবর্ত্তী পদ্ধতি অনুসারে আমাদের কার্য্যকলাপ আরও দুই একজনাকে জানাইতে হইবে। রাসবিহারী প্রথমে আরও অনেকের মতই দলের একজন অতি সাধারণ কর্ম্মী ছিলেন। ক্রমে স্বীয় অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতার গুণে সকলের অলক্ষ্যে এক বিচিত্র সংগঠনের সৃষ্টি করিয়া যেন সহসাই একদিন বিপুল কর্ম্মভার নিজের স্কন্ধে লইয়া নেতৃবর্গের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করেন। যাহা হউক পাঞ্জাবের পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার কথা আনিব না।

এই সময় আমাদের দলের প্রসার পূর্ব্ব বাঙ্গলার শেষ সীমান্ত হইতে পাঞ্জাব প্রবেশের সূচনা করিতেছিল। আমাদের প্রধান নেতা ও পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় নেতৃবৃন্দকে পাঞ্জাবের নবীন সংবাদ দেওয়াই আমার বাঙ্গলাদেশে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গলার কাহাকেও তখন কলিকাতায় পাইতাম না, কেবল যথা স্থানে খবর দিয়া রাখিলাম যেন যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব্ববাঙ্গলার কেহ একজন কাশীতে একবার আসেন এবং পরে কেন্দ্রের নেতৃবর্গের নিকট গিয়া পাঞ্জাবের সকল সমাচার বিশদ ভাবে বলিলাম। তাঁহাদের মধ্যেও এক নব উৎসাহের তরঙ্গ লক্ষ্য করিলাম বটে কিন্তু এতটা যেন তখনও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের কথা বার্ত্তা হইল। যদি বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হয় এবং যদি অবস্থা বিশেষে আমাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ না দিয়া পিছু হটিতে হয় ত সে সময় কোথায় আমরা আশ্রয় লইব; আমাদের খাদ্য সামগ্রী কিরূপে সরবরাহ করিব এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ সূত্র কিরূপে রক্ষা করা যাইবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সে সকলের উল্লেখ করিয়া এখন কোনও লাভ নাই। আমাদের নেতৃবর্গের নিকট আমার আরও একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল; বিদেশ হইতে অনেক শিখদল তখনও দেশে ফিরিতেছিলেন এবং অনেকেই কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া পাঞ্জাব যাইতেছিলেন। আমি নেতাদিগকে এইরূপ বিদেশাগত শিখদলের সহিত সংযোগ সূত্র স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে বলিলাম। খুব শীঘ্রই যে প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈয়ারি করিতে হইবে এবং তাহার আয়োজন এখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত এ কথাও পরে আলোচিত হয়। পরিশেষে আমাদের অতি পুরাতন অথচ নিত্যনূতন আত্মসমর্পণ যোগের কথা ওঠে। এই কথা আরম্ভ হইলে আর যেন শেষ হইত না। পন্থা যতইকেন একই আদর্শ প্রণোদিত হউক না,

সেই একই কথা, একই ভাব, জনে জনে কত নূতন ভঙ্গীতেই না বিকাশ-লাভের চেষ্টা করে! তাই আমরা একভাবের ভাবুক হইয়াও, একই পন্থার অনুসরণকারী হইয়াও আমাদের পরস্পরের মধ্যে কত অসংখ্য স্থানেই না অমিল ছিল! গায়ক সে একই ব্যক্তি; কিন্তু সেই গায়কেরই সেই একই স্বরলহরী পাঁচজন শ্রোতার নিকট কত বিভিন্ন প্রকারের মূর্চ্ছনারই না সৃষ্টি করে! মিলও যথেষ্ট থাকে, কিন্তু অমিলও কি কম থাকে? যে আদর্শ প্রণোদিত হইয়া আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলাম, সে ভাব স্রোতের তরঙ্গ একই স্থান হইতে আসিলেও বিভিন্ন আধারে তাহা আপন বৈচিত্র্যের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আমাদের আদর্শের এই খুটিনাটির দ্বন্দ্বে এমন কত রাত্র পোহাইয়া ভোর হইয়া গিয়াছে, দ্বন্দ্ব কিন্তু মিটে নাই, একজন আর একজনকে ভুল বুঝিয়া যখন পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, উষার রক্তিম রাগ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমটির মত তখন পূর্ব্বগগনে ভাসিয়া উঠিত। পথ অতিক্রম করিতে করিতে নিদ্রালস-নয়ন-পল্লবের মৃদু আক্ষেপে বুঝিতে পারিতাম কতখানি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিশাবসানের পূর্ব্বেই এইসব কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইত এবং পরদিবস নানা কর্ম্মের অন্তরালে গত রাত্রির আলোচনাপ্রসঙ্গ পুনরালাপের জন্য যেন অনুক্ষণ অবসর খুঁজিয়া বেড়াইত, কত দিবস কত কার্য্যাবকাশের মধ্যে কখন যে আসিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিত যেন জানিতেই পারিতাম না। এইরূপে ভাব ও কর্ম্মের মোহন আবেশে আমাদের বিচিত্র জীবন যাপিত ও গঠিত হইতেছিল।

কাশী ফিরিয়া দাদার নিকট শুনিলাম কার্য্য বেশ অগ্রসর হইয়াছে। দাদা বলিলেন, "আজই বিকালে অমুক বাগানে একটি সিপাহির আসিবার কথা আছে, তুমি আজ সেখানে যাইবে।" শুনিলাম সেই শিখ পল্টন বদলি হইয়া কাশী হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক রাজপুত পল্টন আসিয়াছে। বিকালে সেই বাগানে গেলাম। যে বন্ধুটি আমায় বাগানে লইয়া গেলেন পথে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপে তাঁহাদের সহিত এই দলের পরিচয় হইল। বন্ধুবর বলিলেন "ইহারা বাজার ইত্যাদি করিতে আসিতেন, একদিন কেন্টোন্‌মেন্টে যাইবার সময় পথে ইহাদিগকে সহরের দিকে আসিতে দেখি, আমরাও ইহাদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়া বাজারের দিকে ফিরিলাম। পথে বর্ত্তমান যুদ্ধসংক্রান্ত নানা কথা হইল। হিন্দু মুসলমান

সম্বন্ধীয়ও অনেক কথা হইল। হিন্দুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের কথা হইতে হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে প্রথমদিনের পরিচয়ের পর তাঁহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা আছে এবং সেইজন্য আর একদিন এইদিকে আসিতে বলিয়া তাঁহাদের নাম ধাম জানিয়া লইয়া সেদিনের মত তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। পরেরদিন পুনরায় তাঁহারা গঙ্গাস্নানের জন্য সহরে আসিলেন। সেদিন তাঁহাদের নিকট আমাদের ভিতরকার কথা পাড়িলাম। অন্যান্য আলোচনার পর বর্ত্তমান যুদ্ধে বিদেশে বিধর্ম্মিদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চাইতে স্বদেশে স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইলাম। দেখিলাম অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। স্বীয় পল্টনে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত এ বিষয় আলাপ করিয়া পুনরায় আজ আসিবার কথা আছে।" অল্পক্ষণ অপেক্ষার পর দেখিলাম হাতে বাজারের সামগ্রী লইয়া একটি লোক আসিতেছেন। বন্ধুবর বলিলেন ঐ আসিতেছেন। ইঁহার পরিচ্ছদ আপাদমস্তক ধপধপে সাদা ছিল, যেন অন্তরের পরিশুদ্ধতা বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। লোকটির সহিত আলাপ করিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ নমনীয়তা যেন ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে মাখান ছিল। ইঁহার মধ্যে কেমন এক উৎফুল্ল ও উৎসাহের ভাব দেখিয়াছি কিন্তু উত্তেজনার ভাব দেখিনাই। ইঁহার সহিত সেদিন একবারে বারিকের ভিতর গিয়া ইঁহাদের খাটে বসিয়া কত গল্প করিয়াছিলাম। আমরা ইঁহাদের খাটে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম এবং ইঁহারা আমাদের আদর অভ্যর্থনার জন্য নিকটের বাজার হইতে মিষ্টান্ন আনাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩২)

চারুর বাড়ী হইতে একেবারে বাসায় না ফিরিয়া রাখু প্রথমে গঙ্গাস্নান সারিয়া লইল। পথের মাঝে মাঝে যেরূপ জল জমিয়াছিল, আর সেজন্য পথ চলায় সে এমনি অসুবিধা বোধ করিতেছিল, বরাবর বাসায় যাইলে তাহার সেদিন স্নান করিতে আসার আর সময় থাকিত না। গঙ্গাতীর হইতেও সে একেবারে বাসায় ফিরিল না। নিকটেই ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী, সে মনে করিল যাইবার পথে তাঁহাদের খবরটা দিয়া যাই, যথাসময়ে পূজার জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলে পাছে তাঁহারা আজও আসিবার বিষয় সন্দেহ করেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা। বৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে, মাঝে মাঝে আকাশও পরিষ্কার হইবার ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু বাতাস তখনও বেশ প্রবল। সে বাবুর বাড়ীর দোর বন্ধই দেখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু সদর দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই দেখিল, ভৃত্য হেম একটা ছাতা মাথায় দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছে।

বাহির হইতেই তাহার কথা বলিবার সুবিধা হইল বুঝিয়া যেমন রাখু হেমকে সম্বোধন করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি সে দেখিল তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, হেম ছাতা মুড়িয়া চোখের নিমেষে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। যখন রাখু দরজার মুখে উপস্থিত হইল, তখন হেমের অস্তিত্ব চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাইল না।

ওরূপ লুকোচুরি ভাবে চাকরটার চলিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিলেও রাখুর কেমন একটা খটকা লাগিল। কিন্তু চারুর বাড়ীতে রাত্রিবাস সম্বন্ধে হেমের যে উক্তরূপ ব্যবহারের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা একেবারেই রাখুর মনে আসিল না। সে তো জানিত না যে হেমই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে মনে করিল হয়তো বাড়ীর মেয়েদের কেহ বাহির বাটীতে আসিয়াছে, সেইজন্য হেম তাহাকে সতর্ক করিতে ছুটিয়া গেল। এর পূর্ব্বে

এত প্রাতঃকালে সে ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে কখনও পূজা করিতে আসে নাই। অন্য দুই তিন বাড়ীর পূজা সারিয়া সেখানে আটটার পূর্ব্বে কোনদিন সে আসিতে পারে নাই।

অন্য অন্য দিন রাখু বরাবর ভিতর বাড়ীতেই চলিয়া যাইত। আজ আর সে তাহা করিল না কি জানি কাপড় কাচা গা ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া মেয়েরা যদি অসাবধানে থাকে? ভিতর দিয়া যাইতে গেলে কলতলার পাশ দিয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বহির্বাটীর কোনও স্থানে সে হেমকে দেখিল না। সে বাহিরের সিঁড়ি দিয়াই উপরে চলিল। কেমন একটা চিন্তা তাহার মনকে ঘেরিয়াছে, সে মাথা হেঁট করিয়া সিড়িতে উঠিতে ছিল শেষ সিড়িতে পা দিয়া প্রথমে মাথা তুলিতেই দেখিল, বাড়ীর গিন্নি সিড়ির পাশেই বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়েদের আবরু তখনকার কলিকাতার সাধারণ হিন্দু গৃহস্থ-দের অপেক্ষাও কিছু বেশী ছিল। বাড়ীর পুরুষদিগেরও, দিবাভাগে গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে গলায় সাড়া না দিয়া প্রবেশাধিকার থাকিত না। মেয়েরা কদাচ, বাড়ীতে একেবারে পুরুষ না থাকিলে, বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে আসিত। অধিক কি শুভা বিবাহযোগ্য বয়স হইবার পর হইতে আর বাহির বাড়ীতে আসিতে পাইত না।

রাখু সেটা জানিত। সে প্রায় তিনমাস ইহাদের ঘরে ঠাকুর পূজার কাজ করিতেছে। এই তিন মাসে সে দেখিয়া শুনিয়া ইহাদের আবরুর ব্যবহার বুঝিয়াছে। ইহার পুর্ব্বে যিনি এখানে পূজার কাজ করিতেন তিনি বৃদ্ধ, রাখুরই দেশস্থ। শারীরিক পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁর দেশে যাইবার একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান জানিয়া তিনি রাখুকে এখানে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কেন না, আবরু একটু বেশী রকম হইলেও, মেয়েরা পুরোহিত অথবা পূজকের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে বিশেষ সঙ্কোচ প্রকাশ করিত না।

রাখু বৃদ্ধের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া এই গৃহে কয়মাস পূজার কাজ করিতেছে। সে অতি সঙ্কোচের সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার সেইরূপ সঙ্কোচেই পূজা সারিয়া চলিয়া যায়। চক্ষু তাহার মেয়েদের মুখের সঙ্গে কচিৎ পরিচিত হইয়াছে। বৃদ্ধের উপদেশ মত সে ব্রজেন্দ্রের বিমাতাকে

মা বলে, নির্ম্মলাকে বউমা বলে, শুভাকে কেবল দিদি বলিয়া ডাকিতে পায়।

সুতরাং উপরে উঠিয়াই নির্ম্মলাকে বারান্দা ধরিয়া একটু অসঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাখু কিছু অপ্রতিভের মত হইল। তাঁহার মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই বলিবার কথা ঠিক করিতে না পারিয়া মাথা নামাইয়া আবার সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "আপনি এখানে আছেন তা জানতুম না।" নির্ম্মলা অতি শান্তভাবে উত্তর করিল "আপনাকে এদিকে আসতে দেখেই আমি দাঁড়িয়েছি। আপনি কি এখনই পূজা করবেন?"

"পূজার কি আয়োজন হয়েছে?"

"হয়নি একটু অপেক্ষা করলেই করে দি।"

"তা হলে আমি আসি?"

"কখন আসবেন?"

"আসতে একটু বেলা হবে, এই কথাই আমি বলতে এসেছিলুম।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন না?"

"আমি এখনও বাসায় যাইনি। দৈবদুর্ব্বিপাকে কাল আমাকে এক জায়গায় আটকে পড়তে হয়েছিল।"

একথাটা যে নির্ম্মলা রাখুর মুখ হইতে এত শীঘ্র শুনিবে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শুনিবামাত্র তাহার মুখে হাসি আসিল। কোন ক্রমে হাসি সংযত করিয়া সে বলিল—"আমি মনে করেছিলুম ঝড়ের জন্য কাল আপনি ঠাকুরের শীতল দিতে আসতে পারেন নি।"

"বাসায় থাকলে নিশ্চয় আসতুম।"

সমস্ত জানিয়াও, নির্ম্মলা রহস্য করিবার একটু সুবিধা পাইয়া সেটা ছাড়িতে পারিল না। সে ঈষৎ সমবেদনার ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবেত কাল রাত্রিতে আপনার বড় কষ্ট গেছে?"

"না বউমা বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে কাল অনেক বেশী সুখে ছিলাম।

"তা হলে নারায়ণ বিপদে আপনাকে ভাল আশ্রয়ই দিয়েছিলেন বলুন?"

রাখু উত্তর করিল না।

"তারা কি ব্রাহ্মণ?"

"না।"

"কায়স্থ?"

"না।"

আর এগিয়ে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হয় বুঝিয়া নির্ম্মলা প্রশ্ন করিল—

"আপনার তাহলে তো কাল আহার হয়নি!"

"অন্ন হয়নি তবে ফল মূল মিষ্টান্ন খেয়েছি।"

ঠিক এমনি সময়ে হেমকে ঘর হইতে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে রাখু নির্ম্মলাকে বলিল—"বেলা হয়ে যাচ্ছে বউমা, আমি এখন আসি।"

"আসুন।"

কিন্তু রাখু দুই তিনটা সিড়ি নামিতেই নির্ম্মলা বলিল—"একটু দাঁড়ান। ঠিক এমনি সময়ে বৃষ্টি আবার বেশ জোরে চাপিয়া আসিল। নির্ম্মলা আবার বলিল—"আমি শীঘ্র বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে আস্‌চি। আমার না আসা পর্য্যন্ত যাবেন না" বলিয়াই সে দ্রুত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এইরূপ হঠাৎ দাঁড়াইতে বলিবার কারণটা না বুঝিতে পারিলেও কতকটা বৃষ্টির জন্যও কতকটা তাঁর মান রাখিবার জন্য রাখু উপরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলা ফিরিল। তার একহাতে একখানা গরদের ধুতি ও একখানা গরদের চাদর অন্যহাতে একটা ছাতি। নিকটে আসিয়াই সে রাখুকে কাপড়খানা পরিতে বলিল। বলিল—"ভিজে কাপড় চাদর ছেড়ে ছাতিটা নিয়ে চলে যান।"

রাখু বলিল—"না বউমা, প্রয়োজন নেই।"

"আপনার নেই আমার আছে, কাপড়খানায় আলতার রং লেগে আছে। কি জানি কেউ দেখে কি মনে করবে।"

চারুর ঘর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যগ্রতায় মূর্খ ব্রাহ্মণ কাপড়খানার অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিবার অবকাশ পায় নাই। নির্ম্মলার কথায় এখন কাপড়ের দিকে চাহিয়া সে একরূপ আড়ষ্টের মতই হইয়া গেল। নির্ম্মলা কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকিতে দিল না। সে বলিল—"আপনি ঠাকুর এযুগের লোক নন, সুতরাং কলিকাতার লোকের স্বভাব আপনি কিছুই জানেন না। আপনার যে ব্যবসা কাজ কি, লোককে সন্দেহ করতে দেবারই বা দরকার কি? ঐখানে ছেড়ে রেখে যান, আমি কাচিয়ে ঠিক করে রেখে দেবো।"

বলিয়া নির্ম্মলা রেলিংএর কাপড় চাদর ও ছাতি রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

রাখু এই সময়ের মধ্যে আর একবার পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল, "আমি কি আবার আস্‌বো ?"

"সে কি এ আপনার ঘর, আপনি আসিবেন না কেন ? শুধু আসা কি, বল্‌তে ভুলে গিছলুম—আজ এই বাদলে হাত পুড়িয়ে আপনি রেঁধে খাবেন না। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আপনি এই খানেই প্রসাদ পাবেন। আমার নিমন্ত্রণ করা রইল।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেল। এক দয়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে আর এক দয়ার আয়ত্তে পড়িয়া রাখু গোটা কতক চক্ষুজলে গরদের কাপড়খানা সিঞ্চিত করিয়া লইল। তারপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ভিজা কাপড় চাদর নির্ম্মলার কথামত সেইখানেই রাখিয়া সেই বৃষ্টিতেই ছাতি খুলিয়া নামিয়া গেল। এতক্ষণ ব্রজেন্দ্র ঘরের ভিতরে ইজিচেয়ারে ঠেশ দিয়া চোরটির মত চক্ষু মুদিয়া বসিয়াছিল। আর হেমা এক একবার ঘর হইতে উঁকি দিয়া রাখুর চলিয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইল। হেমা দূর হইতে এক একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তাঠাকুরাণীর ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে পারিতেছিল না। এইবারে সে সিঁড়ির কাছে আসিয়া রাখুর পরিত্যক্ত অলক্তক রঞ্জিত বস্ত্র দেখিল। বামুনের রাত্রি-বাসের সেই অপূর্ব্ব নিদর্শন অতি উল্লাসে সে প্রভুকে দেখাইল। ফলে আবার সে ধমক খাইল! নূতন পূজারী আনিবার কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু তাকে বলিল, গিন্নিকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন আর কোন কিছু না করে। সকল কাজে বাধা পাইয়া হেমা যেন মনমরা হইয়া গেল! রাত্রের ব্যাপার লইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সে যে এতটা চেষ্টা করিতে গেল বোকা প্রভুর জন্য সেটা তার সফল হইল না। ইহার উপর তার প্রভুপত্নী যখন তাকে শুধু নূতন বামুন আনিতে নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইল না, রাখুকে বলিতে এমন কি আর কাহারও কাছে পূর্ব্বরাত্রির একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল, তখন তার সমস্ত বুদ্ধি জমাট বাঁধিয়া তাহাকে একবারে নীরব করিয়া দিল।

ইহার একটু পরেই বিশু আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে শুনাইল তাহার 'মা' ভোর-বেলায় সেই যে গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া বাহির হইয়াছে এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরে নাই। সে এবং ঝি দুজনেই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কোনও খোঁজ পায় নাই। এ কথা নির্ম্মলার শুনিতে বিলম্ব হইল না, ব্রজেন্দ্রই কাল বিলম্ব না করিয়া কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিল।

শুনিয়া যদিও নির্ম্মলা চারুর না আসায় নষ্টামির একটা ছিনালি ছাড়া তার বিপদ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কিছু দেখিল না, তথাপি সে স্বামীকে বলিল "এরূপ অবস্থায় সেখানে তোমার একবার যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বিশুকে আগে পাঠাইয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ী চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ডালি

স্বাধীনতা

(শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি)

"মৌলানা হজরত—মোহানি কংগ্রেসে এবং মস্‌লেম লীগের প্রেসিডেণ্ট-রূপে স্বাধীনতার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ দুই বারই তিনি পরাস্ত হইয়াছেন। মৌলানার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছুই নাই। ইংরাজেরা আমাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করিলেও, খিলাফৎ-সমস্যার সুচারু সমাধান হইলেও, তিনি তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে চাহেন। 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' লাভ করিতে—না পারিলে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—এ ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটে না। এ স্থলে আমরা কেবল মতবাদের আলোচনা করিতেছি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে যদি খিলাফতের মীমাংসা না হয়—অর্থাৎ যদি ইংরাজ সরকার মোস্‌লেম জগতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলতাচরণই করিতে থাকে তাহা হইলে যে আমাদের বাধ্য—হইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোনই মতভেদ নাই। ইংলণ্ড মুসলমানের মিত্র হইতে সম্মত না হইলে ভারত কিছুতেই ইংলণ্ডের সমর্থন করিতে পারে না বা তাহার নিকট বৈষয়িক বা নৈতিক কোন প্রকারের সাহায্যই গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু আমি জানি ভারত প্রতাপশালী হইলে ইংরাজের ভাব অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জেদ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অন্যায় হইবে কারণ—তাহাতে আমাদের প্রতিশোধস্পৃহা এবং অসামঞ্জস্য ই সূচিত হইবে।

ইংরাজকে শত্রুতে পরিণত করাতে বা সুযোগ পাইলেই তাহাকে ভারত-হইতে বিতাড়িত করায় ভারতের গৌরব পর্যাবসিত হইবে না, তাহাকে বন্ধু-ভাবে, আমলাতন্ত্র প্রধান সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে এক অভিনব সাধারণ তন্ত্রের সভ্যরূপে গ্রহণ করাতে ইহার পর্য্যবসান ঘটিবে। এই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর দুর্ব্বলতর, অনুন্নত জাতি সমূহের শোষণের উপর, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পশুবলের উপর ঘটিবে না।

ইংরাজ শাসনের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে 'স্বরাজ' অর্থে কি বুঝায় দেখা যাউক। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে এই 'স্বরাজ' দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং 'স্বরাজ' ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ গণ্য হইবে না, ইহাতে ভারতের আত্মপ্রকাশই সূচিত হইবে। পার্লামেন্টের বিধিবিশেষ দ্বারাই স্বরাজ ঘোষিত হইবে ইহা সত্য কিন্তু সে বিধির ভারতের লোকমতের সমর্থন ভিন্ন পৃথক্ কোন সংজ্ঞা থাকিবে না। 'হাউস্ অব্ কমন্স (House of Commons) দক্ষিণ আফ্রিকার 'ইউনিয়ন স্কিমের" (union scheme) একটি বাক্য বা বাক্যাংশ মাত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিবে তবে এ স্থলে এ 'সমর্থন' ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধিস্বরূপ গণ্য হইবে।

এরূপ 'স্বরাজ' এ বৎসর না আসিতে পারে, একপুরুষের মধ্যেও না আসিতে পারে, তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত নহি। মিটমাট হইবার সময় আসিলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতের লোকমতের সমর্থন করিতেই হইবে কিন্তু সে লোকমত আমলাতন্ত্রের মারফত পার্লামেন্টে পৌঁছিবে না, স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই এ লোকমত প্রকাশের যন্ত্র হইবেন।

কোনও জাতি কখনও অধীন জাতিকে 'স্বরাজ' উপহার দিতে পারে না, জাতির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবন গুলির বিনিময়েই এ অমূল্যরত্ন ক্রয় করিতে হয়। এ রত্ন পাইবার জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতে পারিলে ইহার 'উপহারত্ব' দূর হইবে। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন 'তরবারির সাহায্যে আদায় করিতে না পারিলে পার্লামেন্টের মারফত ভিন্ন স্বরাজ আসিতে পারে না।'

ইংলণ্ড ভারতের নির্যাতনবরণরূপ নৈতিক 'চাপ' সহ্য করিতে অসমর্থ—শ্রোতাগণকে একথা অনুমান করিতে দিয়া তিনি ইংলণ্ডকে 'ছোট' করিয়াছেন আর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিবেচনা না

করিয়া যখন খুসী স্বরাজ দিবে একথা বুঝাইবার উদ্দেশ্য থাকিলে শ্রোতাগণের বুদ্ধিশক্তিকে অপমান করা হইয়াছে। মোট কথা—স্বরাজ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অসহনীয় যন্ত্রণাভোগের ফল।

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি তরবারির পরিবর্ত্তে স্বরাজ লাভের অন্য কোন উপায় কল্পনা করিতে পারেন না, এজন্য সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে শাসন পরিষদগুলিতে গলাবাজি করিয়া আমরা এক সময়ে ব্রিটিশপার্লামেণ্টকে স্বরাজ দানের প্রয়োজনীয়তা বা স্বরাজ প্রাপ্তির উপযুক্ততা সম্বন্ধে সচেতন করিতে সমর্থ হইব কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিবেন তরবারি অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর পন্থাও আছে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধই সেই পন্থা। ভারতের 'নিজস্ব' ফিরিয়া পাইতে হইলে দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই পথ, আর নিরুপদ্রব প্রতিরোধই যে ক্লেশসহনের পথ সুগম করিয়া দিবে তাহা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইতেছে।

আমরা আমাদের 'নিজস্ব'—এখনও পাই নাই। এখনও হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করেন, অস্পৃশ্য জাতিগুলি এখনও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য অনুভব করে নাই। পার্শি ও খৃষ্টানগণ এখনও নিশ্চিন্তরূপে জানেন না 'স্বরাজের' অধীনে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে; এখনও আমরা নিজেদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা বা কৌশল সম্যক্ শিক্ষা করিতে পারি নাই, এখনও 'খাদি' জাতীয় পরিচ্ছদে পরিণত হয় নাই, এখনও চরকা প্রতি গৃহস্থালীতে স্থান পায় পাই অর্থাৎ এখনও আমার আত্ম-রক্ষার কৌশলগুলি বুঝিতে ও শিখিতে পারি নাই।

এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ মনে করেন 'হিংসা' ভিন্ন 'স্বরাজ' মিলিতে পারে না। এই মতের পোষণকারিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও বর্ত্তমানে নিতান্ত নগণ্য নহে। ইঁহাদের মতে 'হিংসা' ও 'অহিংসা' উভয়কেই একত্র অবস্থান করিতে দেওয়া উচিত অর্থাৎ 'অহিংসা' 'হিংসার' জন্য প্রস্তুত হইবার উপায়-রূপে ব্যবহৃত হউক। ইঁহারা জানেন না জগৎকে কতখানি প্রতারিত করিতেছেন। লক্ষসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়রূপে অহিংসানীতির উপকারিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—ইহাই আমাদের 'প্রতিজ্ঞা'। 'অহিংসা' দ্বারা অথবা 'হিংসা' ভিন্ন স্বরাজ লাভ করা যায় না—এই বিশ্বাস যাঁহার জন্মিবে তৎক্ষণাৎ আপন 'প্রতীজ্ঞা' নাকচ করিতে তিনি নৈতিক হিসাবে বাধ্য। যতদিন সম্ভব অহিংসা আমাদের ধর্ম্ম থাকিবে। পরীক্ষাত্মক বলিয়াই অহিংসানীতির উপযোগিতা এত অধিক। যতদিন 'অহিংসা'

আমাদের ব্রত থাকিবে ততদিন শুধু যে নিজে ইহার উপকারিতায় সম্যক্ বিশ্বাস করিতে ও কার্য্যে ইহা আচরণ করিতে হইবে তাহা নহে, অন্যকে হিংসানীতি বর্জ্জন করাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে এবং ইহার আচরণকারিগণের প্রতিবাদ করিতে হইবে। যাঁহারা কংগ্রেসের অনুশাসনকে মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কথায় ও কার্য্যে অহিংস থাকেন নাই এবং 'চিন্তায়' অহিংস থাকিবার চেষ্টা করেন নাই, এজন্যই আমার এখন পর্য্যন্ত লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া)

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ

জাতীয়শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন ইহাকে একটী বিশিষ্ট আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা আমরা এতদিন পাইয়া আসিয়াছি, তাহা যেন ঠিক আমাদের উপযুক্ত হয় নাই। এ যাবৎ যাঁহারা এ শিক্ষা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল —তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, এই বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর কোন না কোন স্থানে একটা প্রকাণ্ড গলদ রহিয়া গিয়াছে। অসহযোগীরা বলেন এ শিক্ষার প্রধান গলদ—Slave Mentality—অর্থাৎ দাসজনোচিত মনোভাবের সৃষ্টি। কথাটী আদৌ অসঙ্গত নয়। ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার দোষ এ কথা আমরা বলিতে চাহি না; তবে ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। কতকগুলি বিজাতিদ্বেষী ইংরাজ শিক্ষক ও লেখক হয়ত এ ভাবটী সৃজনের পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজের ইতিহাস বা সাহিত্য ইহার জন্য দায়ী নহে। ইংরাজ ব্যবসায়িগণের কল্যাণে যখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে দেশীয়গণের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল—এবং নানাবিধ বৈদেশিক বিলাসব্যসনের আতিশয্যে আমাদের ঘর ও বাহির, মন ও দেহ ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল—

সেই সময় ইংরাজীশিক্ষার মন্ত্রপ্রভাবে আমাদের নিকট অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পথ খুলিয়া গেল; সেটা ইংরাজের আপিস-আদালত ইত্যাদি কর্ম্মস্থানে চাকরি গ্রহণ। ক্রমে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতগণ চাকরির নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিত আছে—"যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত"; ছেলেবেলায় যখন লেখাপড়ায় একটু-আধটু শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছি তখনই আমাদের নিকট প্রলোভনের চিত্র ধরা হইয়াছে—লেখাপড়া শিখিলে বড় চাকরী পাওয়া যায়—উকিল হওয়া যায়, জজ্-ম্যাজিষ্টর হওয়া যায়, গাড়ী-ঘোড়া চড়া যায়, "লেখা পড়া শিখে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" এই আরাম উপভোগ বর্ত্তমান শিক্ষার যথার্থ আদর্শ। এ শিক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগরিত করিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না। জীবনকে এক অখণ্ড সত্যরূপে উপলব্ধি করাইবার শক্তি এ শিক্ষায় নাই; এ চায় শুধু আরাম, শুধু উপভোগ,—অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব, নিজের উপর নহে। জীবনের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া তাহার চরম পরিণতির প্রতি ইহার আদৌ লক্ষ্য নাই। আমাদের প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই—উহার গতি জীবনের চরম পরিণতির দিকে। আর্য্যেরা মানবজীবনের চারিটী স্তর আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্য্য—ছাত্রজীবন; সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ ও কঠোরতার দ্বারা জীবন-গঠন—তাহার সম্মুখে কোনরূপ আরামের চিত্র ধরা হয় নাই। কঠোর সংসার-সমরক্ষেত্রে যেরূপ সংযতভাবে সৈনিকপুরুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে—তাহারই উপযোগী শিক্ষা সে পাইবে। তারপর গার্হস্থ্য; এখানেও ধর্ম্মার্থে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয় চরিতার্থে নয়। অতিথিসেবা, দীন-দরিদ্র অনাথ আতুরের জন্য জীবনের সুখবিসর্জ্জন—ইহাও চাই। তারপর বানপ্রস্থ, পরে যতি। ইহাই ভারতের শিক্ষা। পরম সত্য যে ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত জীবনেরই লক্ষ্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রয়াস। তথাপি ভারতবর্ষ সংসারকে অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করেন নাই। ভোগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই। সাংসারিক সুখও ভারতের অন্যতম কাম্য; তবে তাহা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া নহে। সে সুখেরও প্রারম্ভে বিদ্যাশিক্ষা আছে—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখং॥

কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের

সাথে"। সেবার যখন স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন একদল ছেলে স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিল জাতীয় শিক্ষা পাইবার জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের ফলেও অনেক ছাত্র বাহির হইয়াছিল। অনেকে আবার ফিরিয়া গিয়াছে। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ছাত্রগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী উচ্ছেদের নিমিত্ত। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি ছাত্রগণকে অগ্র-পশ্চাৎ অনেক বিবেচনা করিয়া তবে এ আন্দোলনে যোগদিবার কথা বলিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা স্বতন্ত্র। একটা উচ্ছেদ আর একটা নব সৃষ্টি। তবে প্রথমটীর অবশ্যম্ভাবী ফল যে দ্বিতীয়টা তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করিলে এতদিন জাতীয় শিক্ষার আয়োজন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত। আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা পড়া চলিতেছে। দুই দশটা বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ কি? ইহার সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে আমাদের জীবনের সহিত ইহার মিল নাই। সেই জন্য এই শিক্ষা আমাদিগকে জীবনের গন্তব্য পথে পরিচালিত করে না, ইহার ভারে আমরা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের জীবন চিন্তাক্লিষ্ট দাসত্বভারে অবনত। নূতন সৃজনের শক্তি আমাদের নাই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণ সমগ্র বিরাট জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। দুর্ব্বল প্রতিবাসীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে কিছু সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দিনপাত করেন। ওকালতী ডাক্তারী ইত্যাদি ব্যবসায়ের নীতি ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিবাদের মীমাংসায় নয়, নূতন বিবাদের সৃষ্টিতে ব্যবহারাজীবের আনন্দ; রোগ আরোগ্য করায় নয়, দেশে নূতন নূতন ব্যাধির উদ্বোধনসঙ্গীতেই ডাক্তারের আনন্দ। কোন নূতনভাবের প্রচারে গ্রন্থকারের কিছু আগ্রহ দেখি না, কি করিয়া তাঁহার পুস্তকখানি সর্ব্বত্র কাটতি হইবে ইহাই তাঁহার চেষ্টা। প্রতিবৎসরেই ছাত্রগণ অঙ্ক শিখিবার জন্য নূতন নূতন পাটিগণিত, বীজগণিত কিনিয়া থাকে। শিক্ষার অভাব যতই অনুভূত হইতেছে, শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যও ততই অধিক হইতেছে। আদালতে যেমন অনেক টাকা খরচ করিয়া বিচার ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ অতি উচ্চহারে বিদ্যা-বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে; অথচ জীবনযাত্রার পক্ষে সে বিদ্যার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, একথা বোধহয়

স্বীকার না করিলেও চলে। দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যালয়ে স্থান নাই। তাহাদের নিজেদের বাসগৃহ যতই কুৎসিত হউক না কেন, বিদ্যালয়টী অট্টালিকা হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা কর্ত্তৃপক্ষ যে বিদ্যালয়কে আমলেই আনিবেন না। কেহ পাঠ করুক বা নাই করুক, বিদ্যালয়ের পাঠাগার বহুমূল্য পুস্তক ও আলমারীতে পরিপূর্ণ করা চাইই-চাই। অথচ এই বাংলা দেশের এমন একদিন ছিল, যখন হরিঘোষের গোয়াল ঘর হইতে মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বাহির হইয়া সমগ্র দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভাঙ্গা চালের নীচে দরিদ্র অধ্যাপকের টোলে কুমার, নৈষধ, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাণিনির নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু আজকাল শিক্ষার আয়োজনেই সর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষগণের নাসিকা-কুঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভার!

আজ দেশের সর্ব্বত্র কথা উঠিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—শুধু নাম পরিবর্ত্তনে নয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-সংস্কারে নয়; এই শিক্ষা (অর্থাৎ এই শিক্ষাপ্রণালী) একেবারে বর্জ্জন করিয়া নূতন প্রণালীতে সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সাধারণের সহিত শিক্ষিতগণের যোগসাধন করিতে হইবে। এই মিলন যদি কখনও সম্ভবপর হয় তবেই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা নহে। বঙ্গের পরিত্যক্ত পল্লীগুলিতে শিক্ষিতগণকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সহরে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিলে বা বক্তৃতা করিলে, কোনও ফল ফলিবে না। একদল ত্যাগী কর্ম্মী আবশ্যক যাঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া এক একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। অনেককে মুখে বলিতে শুনিয়াছি, পল্লীগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, অথচ তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু সেই পল্লীরই কৃষকগণের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ লইয়া মটরগাড়ী চালাইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। পল্লীতে আসিয়া পল্লীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধা মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে জাতীয় জীবনের মুক্তি অসম্ভব। প্রথম যাঁহারা আসিবেন সকল রকমের অসুবিধার মধ্যেই তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। নিত্য দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে। ভয় করিবে না; সাহসে ভর করিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতে হইবে। একনিষ্ঠ সাধকের মত তাঁহাকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। দেশের জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে হয়ত একাজ অতি সহজে

পারিতেন ; কিন্তু তাঁহারা সহসা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া মনে হয় না একদল শিক্ষিত যুবককে অগ্রণী হইতেই হইবে, তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে অনেক সহায়তা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন দেশব্যাপী এই আন্দোলন চলিতেছে ; কার্য্যারম্ভের ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

প্রাচীনভারতে গণতন্ত্র

[শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় বি, এ]

(১)

(প্রাচীন-ভারতে প্রজাতন্ত্র রাজ্য—মালব ক্ষুদ্রক প্রভৃতি)

প্রাচীন ভারতের কোনও ইতিহাস প্রাচীন ভারতবাসী কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই, ফলে প্রাচীন ভারতের অবস্থার কথা জানিতে হইলে অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক বিবরণ করিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এক্ষণে কতকটা এ অভাব ঘুচিয়াছে এবং কতিপয় মহাত্মার সমবেত চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাই আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি। প্রাচীন ভারতে প্রজাদের হস্তে শাসনভার যে আদৌ ন্যস্ত ছিল না এবং রাজাই যে সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিলেন সে ধারণা এখন কিন্তু অনেকের মনে বদ্ধমূল। বহুদিন হইতে আমরা শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি যে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ প্রজাতন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং প্রজারাও যে ইচ্ছা করিলে শাসনকার্য্যের অনেকখানি হস্তগত করিতে পারে সে কল্পনা তাহাদের মনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চ্চার ফলে আমরা বুঝিয়াছি যে প্রাচীন ভারতে শুধু প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এমন নহে ভারতের অনেক অংশ পুরাকালে প্রজাদের দ্বারাই শাসিত হইত। ১৯০৩ সালে অধ্যাপক Rhys Davids তাঁহার "বৌদ্ধভারত" নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"অতি প্রাচীনকালে ভারতের যে সকল অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল তাহার কয়েক অংশে

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল.....................অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ জাজ্জল্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচীন ভারতে ন্যূনাধিক স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া প্রজারাই খানিকটা শাসন করিত।" (Buddhist India p. p. 19-20) উক্ত সালেই Vincent Smith Royal Asiatic Society Journal এ প্রাচীন পাঞ্জাবের প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত স্থান সমূহের একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে দেখাইয়াছিলেন যে ঝাঙ্গ জেলায় Maloi নামে Amritasar, Gurudaspur, Kangra এবং Hosiarpur প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে Oxydrakai নামে, এবং লাহোরের উত্তরে রাবিনদীর পূর্ব্বতীরে Kathaioi নামে প্রজাদের দ্বারা শাসিত তিনটী রাজ্য ছিল। Dr. Thomas প্রমাণ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত 'গণ' শব্দের দ্বারা যেসকল স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সকল স্থানকে বুঝাইত। Mr. Jayaswal ১৯১২ সালে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের জন্য হিন্দীতে এবিষয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও পর বৎসরের Modern Review এ "An Introduction to Hindu Polity" শীর্ষক প্রবন্ধে 'গণ' শব্দ যে এইরূপ অর্থেই প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত হইত সে সম্বন্ধে নানাস্থান হইতে অনেক প্রমাণ দিয়াছিলেন। Bhuler মনুস্মৃতির অনুবাদ কালে 'গণ' শব্দকে ইংরাজীতে "Corporation" (অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের সমিতি) বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোনও দোষ নাই; তিনি মনুস্মৃতির টীকাকারগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। মনুস্মৃতি যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে হয়ত ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু মনুসংহিতার টীকাকারগণ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের একেবারে বিলোপসাধন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের সমিতি বুঝাইতে সংস্কৃত সাহিত্যে "সম্ভূয় সমুত্থান" "শ্রেণী" "পূগ" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ও তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইয়া "গণ" পদের প্রতিশব্দে "সমূহো বণিগাদীনাম্"এর প্রয়োগ করিয়াছেন। [মনু ১ম অঃ, ১১৮ শ শ্লোকের কুল্লুক ব্যাখ্যা]

(২)

প্রাচীন হিন্দুরাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন না—জাতক; রামায়ণ মহাভারতাদির প্রমাণ।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের বহুদিন হইতেই বিশ্বাস যে দিকপালগণের অংশে রাজাদের উৎপত্তি অর্থাৎ 'Divine Origin of Kings theory'টী ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া রাজারা যে

যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন এমন নহে ; এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। তেলপত্ত জাতকে একটী গল্প আছে যে তক্ষশীলার একজন অধিপতি এক যক্ষিণীর মায়ায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে যক্ষিণী যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার রূপে ও মোহিনী মায়ায় রাজা এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার কোনও আব্দার রক্ষা না করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল তখন সে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইবার আশায় রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সকল ক্ষমতাই নিজহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিল। রাজা তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বলিলেন—'রাজ্যের সমস্ত প্রজা আমার অধীন নহে অথবা আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদের প্রভু নহি, যাহারা রাজদ্রোহী অথবা অন্য কোনও অপরাধে অপরাধী তাহারাই আমার অধীন, সুতরাং সমস্ত রাজ্যের অধিকার আমি কেমন করিয়া তোমার হস্তে দিব ?" এই গল্প হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে যে রাজার ক্ষমতার একটী সীমা ছিল, যাহা-ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অন্ততঃ যে সময়ের কথা উপরিলিখিত পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে সে সময়ের ভারতীয় রাজগণ বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাহীন না হইলেও অনেক বিষয়ে যে তাঁহাদিগকে সংযতভাবে চলিতে হইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আবার Eka-panna Jataka নামক গল্পে আছে যে এক রাজপুত্র এতই দুর্দ্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ ছিলেন যে তাঁহার নাম হইয়াছিল 'দুষ্টকুমার'। সেই দুষ্টকুমারের পিতা পুত্রের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য একজন বিজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। প্রবীণ শিক্ষক ছাত্রকে একটী বৃক্ষের মুখে লইয়া একটী বৃক্ষপত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। রাজপুত্র সেই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পত্র ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই চর্ব্বণ করিবামাত্র বৃক্ষপত্রের তিক্ত আস্বাদে এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া সমূলে বৃক্ষটিকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সেই ঋষি বলিলেন—"রাজপুত্র ! এই বৃক্ষটী বড় হইলে ইহার দ্বারা পৃথিবীর মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইবে এই আশঙ্কায় আপনি যেমন এটিকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, সেইরূপ আপনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া রাজা হইলে প্রজাদের প্রভূত অহিত সাধন করিবেন এই ভয়ে প্রজারাও আপনার ক্রোধপরায়ণতা দর্শনে আপনাকে রাজা হইতে দিবে না এবং আপনাকে বনে গমন করিতে

হইবে।" এই গল্পটী হইতে বেশ বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতে এককালে রাজারাও যেমন যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না তেমনি রাজপুত্ররাও যদি অনুপযুক্ত বা প্রজাদের অহিতকামী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, প্রজারাই তাঁহা-অভিষেককালে বাধা দিত।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে মহারাজ প্রতীপ যখন বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার প্রিয়পুত্র দেবাপিকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন প্রজা'বৃন্দ তাহাতে আপত্তি করিল। দেবাপি সুযোগ্য হইলেও রোগগ্রস্ত ছিলেন সুতরাং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় প্রজারা তাঁহার অভিষেককালে বাধা দিল। প্রতীপ তাহাদের বাধা প্রদানে দুঃখিত হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন মাত্র, তথাপি প্রজাবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেবাপিকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন নাই। আবার শান্তিপর্ব্বে আছে, সূর্য্যবংশীয় নরপতি সগর প্রজাদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অসামঞ্জস্যকে ক্রুদ্ধস্বভাবের জন্য স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-পর্ব্বে আছে যে, মহারাজ ক্ষণিকনেত্রকে তাঁহার প্রজাবৃন্দ অপসারিত করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। রামায়ণে আছে যে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণগণ, বলমুখ্য এবং পৌর ও জানপদবর্গের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। যযাতি পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রজাগণকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অভিমত অনুসারে তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

আর একটী বিষয় আলোচনা করিলে বেশ দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা কতদূর সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রজাদের হস্তে কতখানি অধিকার ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র উভয়পুস্তকেই আছে যে প্রজার অর্থ অপহৃত হইলে রাজা যদি সেই অর্থের পুনরুদ্ধার করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে নিজ ধনাগার হইতে তাঁহাকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। পূর্ব্বে রাজারা এইরূপ করিতেন, তাহা না হইলে উভয় পুস্তকেই এইরূপ ব্যবস্থা করিবার তাৎপর্য্য কি? এই সামান্য বিষয়েও যখন রাজাকে প্রজাদের মুখ চাহিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত তখন রাজারা যে কতকাংশে প্রজাদের করায়ত্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (ইতিহাস ও আলোচনা)

———

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত।

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিকৃত স্বর পাঁচটি যথা কোমল, ঋ, জ্ঞ, দ, ণ এবং কড়ি হ্ম। নারদ মতে শুদ্ধ সপ্ত স্বর কতিপয় পশু পক্ষীর স্বর হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বরের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন। স্বরগুলি সাধিবার সময় ঐ সকল দেবতার রূপ ভাবিয়া সাধিতে হয়।

কোন্ প্রাণী হইতে কোন্ স্বর লওয়া হইয়াছে এবং কে কোন্ স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

	প্রাণী—	স্বর—	সংজ্ঞা—	অধিষ্ঠাতৃদেবতা।
১।	ময়ূর	ষড়জ	সা	অগ্নি।
২।	বৃষ	ঋষভ	রে	ব্রহ্মা।
৩।	ছাগ	গান্ধার	গা	সরস্বতী।
৪।	সারস	মধ্যম	মা	মহাদেব।
৫।	কোকিল	পঞ্চম	পা	বিষ্ণু।
৬।	অশ্ব	ধৈবত	ধা	গণেশ।
।	হস্তী	নিষাদ	নি	সূর্য্য।

"ষড়্জ রৌতি ময়ূরোহি গাবোনর্দ্দন্তিচর্ষভম্।
অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চোনদতিমধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলোরৌতি পঞ্চমম্।
অশ্বশ্চধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতিকুঞ্জরঃ॥"

—সঙ্গীতদর্পণম্।

"বহ্নিব্রহ্মসরস্বত্যঃ সর্ব্বশ্রীশ গণেশ্বরাঃ।
সহস্রাংশুরিতি প্রোক্তাঃ ক্রমাৎষড়্জাদিদেবতাঃ॥"

—সঙ্গীতদর্পণম্।

৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়কৃত সঙ্গীত সারের মতে "পঞ্চম" স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা 'লক্ষ্মী"।

সঙ্গীত সময় সারের মতে সপ্তস্বরের নিরুক্তি এইরূপ,—নাসা, কণ্ঠ, বক্ষ,

তালু, জিহ্বা এবং দন্ত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "ষড়্জ"; ঋষভের অর্থাৎ ষাঁড়ের শব্দের ন্যায় বলিয়া "ঋষভ"; নাভি হইতে উদিত হইয়া কণ্ঠ এবং শীর্ষে সমাহত হইয়া গন্ধর্ব্ব গণের সুখ উৎপাদন করে বলিয়া গান্ধার; নাভিতে সমুত্থিত হইয়া হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থলে সমাহত হয় বলিয়া মধ্যম; নাভি, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, শির এবং হৃদয় এই পঞ্চ স্থানে সমুদ্ভব হয় বলিয়া পঞ্চম; নাভি, কণ্ঠ, তালু, শির এবং হৃদিস্থলে ধৃত হয় বলিয়া ধৈবৎ; এবং নাভিতে সমুত্থিত বায়ু কণ্ঠতালু শিরোহত হইয়া নিষণ্ণ (স্থিত) হয় বলিয়া নিষাদ নামে অভিহিত হয়।

রত্নাবলিতে স্বরোৎপত্তিবিষয়ে বলা হইয়াছে যে ঋগ্বেদ হইতে ষড়জ এবং ঋষভ, যজুর্ব্বেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার এবং পঞ্চম, আর অথর্ব্বেদ হইতে নিষাদের জন্ম।

বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত উৎপত্তি বিবরণের মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলি উদ্ধৃত করা হইল না।

সঙ্গীত শাস্ত্রে সপ্ত স্বরের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কোন জাতি; জম্বুদ্বীপাদি কোন দ্বীপে, দেব' পিতৃ, ঋষি, অসুর প্রভৃতি কোন কুলে ইহাদের জন্ম, কাহার কোন ঋষি এবং কাহার কি ছন্দ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এ সকলের মূল শ্লোকও দেওয়া হইল না।

কোন রসে কোন স্বর ব্যবহার্য্য তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র রসে—সা এবং রে। ভয়ানক এবং বীভৎস রসে—ধা। করুণ রসে—গা এবং নি। হাস্য এবং আদিরসে—মা এবং পা। যথা—

সরীবীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো-বীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যো গ-নী—তুকরুণে—হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম্পৌ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে ঐ সকল রসে ঐ সকল স্বরেরই বহুল ভাবে ব্যবহার হওয়া উচিত।

উল্লিখিত সপ্ত স্বর ব্যতীত আরও কতগুলি সূক্ষ্ম স্বর ভারতীয় সঙ্গীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে শ্রুতি বলে। শ্রুতির ব্যবহারই হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব। কি কণ্ঠে কি যন্ত্রাদিতে বিশুদ্ধ ভাবে শ্রুতির ব্যবহার করিতে পারিলে সঙ্গীতে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা উৎপন্ন হয়, এবং শ্রোতার মন বিমোহিত করিয়া ফেলে। সারঙ্গ এস্রাজ বেহালার গমক এবং বীণ, সরদ, রবাব, সুরবাহার সেতারের মীড় এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বাজান হয়।

সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতির লক্ষণ
এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণান্নাদোঽনুরণনং বিনা।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

—সঙ্গীত দর্পণম্।

অনুবাদ—অনুরণন ব্যতীত ধ্বনি স্বরূপ মাত্র শ্রবণ হেতু
শ্রুতি বলিয়া অভিহিত, তাহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ স্বীকৃত।

"শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বানিরেব শ্রুতিভবেৎ।"

—বিশ্বাবসু।

অনুবাদ—শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়াই ধ্বনি শ্রুতি
রূপে পরিচিত হইয়া থাকে।

শ্রুতির সংখ্যা মোট ২২টি। যথা—

সা^{৪} রে^{৩} গা^{২} মা^{৪} পা^{৪} ধা^{৩} নি^{২} সা$^{\circ}$ = ২২

উল্লিখিত সারণী হইতে দেখা যাইবে যে সপ্ত স্বর পরস্পর একটির পর আর একটী কতশ্রুতি অন্তর অবস্থিত। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতির নাম জাতি প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বর—		শ্রুতির নাম—	জাতি।
১। ষড়জ—	সা	১। তীব্রা	দীপ্তা।
		২। কুমুদ্বতী	আয়তা।
		৩। মন্দা	মৃদু।
		৪। ছন্দোবতী	মধ্যা।
২। ঋষভ—	রে	১। দয়াবতী	করুণা।
		২। রঞ্জনী	মধ্যমা।
		৩। রতিকা	মৃদু।
৩। গান্ধার—	গা	১। রৌদ্রী	দীপ্তা।
		২। ক্রোধা	আয়তা।
৪। মধ্যম—	মা	১। বজ্রিকা	দীপ্তা।
		২। প্রসারিণী	আয়তা।
		৩। প্রীতি	মৃদু।
		৪। মার্জ্জনী	মধ্যা।

স্বর—		শ্রুতির নাম—	জাতি—
৫। পঞ্চম—	পা	১। ক্ষিতি	মৃদু।
		২। রক্তা	মধ্যা।
		৩। সন্দীপনী	আয়তা।
		৪। আলাপিনী	করুণা।
৬। ধৈবত—	ধা	১। মদন্তী	করুণা।
		২। রোহিনী	আয়তা।
		৩। রম্যা	মধ্যা।
৭। নিষাদ—	নি	১। উগ্রা	দীপ্তা।
		২। ক্ষোভিনী	মধ্যা।

সপ্ত স্বরের ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধ গতির নাম অনুলোমগতি বা আরোহণ, আর নিম্নগতির নাম বিলোম গতি বা অবরোহণ।

সপ্তস্বরের ক্রমে আরোহণ ও অবরোহণের নাম "মূর্চ্ছনা"। সাতটি করিয়া তিন গ্রামে মূর্চ্ছনার সংখ্যা একুশটি যথা—

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।,,
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্তচ॥

গ্রাম, ষড়জ, গান্ধার এবং মধ্যম ভেদে তিনটি। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম মর্ত্তে আর গান্ধার গ্রাম স্বর্গে প্রচলিত। যথা—

"ষড়জ মধ্যম গান্ধারাস্ত্রয়োগ্রামামতাইহ।
ষড়্জ গ্রামো ভবেদত্র মধ্যম গ্রাম এবচ।
স্বরলোকে চ গান্ধারো গ্রাম প্রচরতি স্বয়ং॥
—সঙ্গীত চন্দ্রিকা ধৃত বচন।

উক্ত সাতটি স্বরই রাগ বিশেষ বাদি, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কোন একটি রাগে যে স্বরটি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় তাহাই "বাদী", যে স্বরটি বাদী স্বরাপেক্ষা কম কিন্তু অন্য স্বরাপেক্ষা বেশী লাগে তাহা "সংবাদী", যে স্বর সর্ব্বাপেক্ষা কম লাগে তাহা অনুবাদী, আর যে স্বর একেবারেই লাগে না অর্থাৎ যে স্বর ব্যবহার করিলে কোন রাগ অশুদ্ধ হয় তাহাই "বিবাদী" স্বর বলিয়া কথিত হয়। বাদী স্বর যেন রাজা, সম্বাদী যেন তা'র মন্ত্রী, অনুবাদী যেন ভৃত্য, আর বিবাদী যেন তাহার শত্রু।

চতুর্বিধঃ স্বরো বাদী সংবাদীচ বিবাদ্যপি।
অনুবাদীচ বাদীতু:প্রয়োগে বহুল স্বরঃ ॥
—রত্নাকর।
বাদী রাজা স্বরস্তস্ত সংবাদী স্যাদমাত্যবৎ।
শত্রুর্বিবাদী তস্ত স্যাদনুবাদী তু ভৃত্যবৎ॥"
সঙ্গীতদর্পণম্ ॥

গীতের আদিতে যে স্বর স্থাপিত হয় তাহাকে গ্রহস্বর এবং যে স্বরে গীত সমাপ্ত হয় তাহা ন্যাস স্বর বলিয়া কথিত হয়। বাদী স্বরকে অংশ স্বর ও বলা হয়। যথা—

গীতাদৌ স্থাপিতো যস্ত স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাস স্বরস্ত বিজ্ঞেয়ো যস্ত গীত সমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে ॥
—সঙ্গীতদর্পণম্।

তিনটীমাত্র মূল বর্ণের সকৌশল মিশ্রণে যেমন নানা বর্ণের উৎপাদন করিয়া প্রকৃতিবাণী প্রভাতে সন্ধ্যায় কত ভঙ্গীরইনা রঙের খেলা দেখাইয়া আমাদের নয়ন মন মোহিত করিতেছেন, সেই রূপ ৭টি মাত্র মূল স্বরের বিচিত্র বিন্যাস কৌশলের দ্বারা কত কত বিচিত্র রাগ রাগিণী সৃষ্টি করিয়া যুগ যুগান্ত হইতে মানবকুল শ্রোতৃচিত্তে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। ভারতীয় রাগ রাগিণী সমুহের উৎপত্তি কাহিনী এইরূপ।

শিবশক্তির সমাযোগেই রাগরাগিণীর উদ্ভব হইয়াছিল। শিবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি আর গিরিজার বদনকমল হইতে আর একটি এই ছয়টি রাগের সৃষ্টি হয়। শিবের সদ্যোবক্ত্র হইতে শ্রীরাগের, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম এবং ঈশানাখ্যবদন হইতে মেঘরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর গিরিজা যখন লাস্যলীলায় ব্যাপৃতা ছিলেন তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জন্মিয়াছিল নাট্টনারায়ণ নামক ষষ্ঠ রাগ। যথা—

"শিবশক্তি সমাযোগাদ্ রাগাণা ং সম্ভবো ভবেৎ।
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চরাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠস্ত গিরিজামুখাৎ ॥
সদ্যোবক্ত্রাতু শ্রীরাগো বামদেবাদ্ বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ ভৈরবোঽভূৎ তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোঽভবৎ ॥

ঈশানাখ্যাগ্মেঘরাগো নট্টারস্তে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্তে নট্টনারায়ণোঽভবৎ॥"

—সঙ্গীত দর্পণম্।

হরপার্ব্বতীর মুখ হইতে ছয়রাগের সৃষ্টি হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রথমে ব্রহ্মা এই সকল রাগ শিক্ষা করেন। পরে তিনি প্রত্যেক রাগের পত্নীরূপে ছয়টি করিয়া ছয়ত্রীশটি রাগিণী সৃষ্টি করেন, এবং সেই সমস্ত রাগ রাগিণী নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু (ইনিই তাম্বুরার সৃষ্টি কর্ত্তা), হুহু এবং ভরত এই পাঁচজন শিষ্য ও শিষ্যাকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই একখানি করিয়া সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবর্ষি এবং ভরত প্রণীতগ্রন্থ ভূতলে, রম্ভার গ্রন্থ :স্বর্গে এবং হুহু ও তুম্বুরুর সংহিতা পাতালে প্রচলিত হয়। যথা—

"ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেবচ।
পঞ্চশিষ্যাং স্তুতোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধিঃ॥
ততঃ সঙ্গীতকং কৃত্বা গ্রন্থং সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
আনন্দয়ন্ দেবরাজং শিষ্যাস্তে ভরতাদয়ঃ॥
রম্ভয়া রচিতা স্বর্গে ততঃ সঙ্গীত সংহিতা।
প্রচচার তয়া শক্রো নাট্যানুষ্ঠানমতনোৎ॥
প্রচার চ পাতালে হুহুতুম্বুরু সংহিতা।
দেবর্ষের্ভরতস্যাপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা॥"

ইতি শ্রীনারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতায়াং রাগনির্ণয়ে
তৃতীয়াধ্যায়ে।—উপক্রমণিকা সঙ্গীত সার।

একদা রম্য কৈলাসশৃঙ্গে বিল্বমূলে শিব সমীপে সুখাসীনা পার্ব্বতী ভগবানকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, রাগ রাগিণীগুলির কোনটী রাগ কোনটীই বা রাগিণী, তাহাদের রূপইবা কেমন, কোন্ ঋতুতে কোন্ সময়ে কোনটি গাওয়া যায় এ সমস্ত আমায় কৃপা করিয়া বলুন।

তখন ঈশ্বর বলিলেন,—শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ এবং বৃহন্নাট (অর্থাৎ নট্টনারায়ণ) এই ছয়টি রাগ বলিয়া কথিত হয়। যথা—

"শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘ রাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

তাহার পর বলিলেন,—

মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, এবং পাহাড়িকা এই ছয়টী শ্রীরাগের বরাঙ্গণা।

দেশী, দেগিরী, বরাটী, তোড়িকা, ললিতা, এবং হিন্দোলী এই ছয়টী বসন্তের বরাঙ্গনা।

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, বামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী এই ছয়টী ভৈরবের বরাঙ্গনা।

বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী এবং পঠমঞ্জরী এই ছয়টি পঞ্চমের অঙ্গনা।

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, ও হরশৃঙ্গরা এই ছয়টী মেঘমল্লারের যোষিৎ।

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও নট্টহম্বীরা এই ছয়টী নট্টনারায়ণের অঙ্গনা।

এই গুলির আর মূলশ্লোক দেওয়া হইল না।

রাগিণীযুক্ত	শ্রীরাগ	শীত	ঋতুতে গাইবে।
”	বসন্ত	বসন্ত	” ”।
”	ভৈরব	গ্রীষ্ম	” ”।
”	পঞ্চম	শরৎ	” ”।
”	মেঘরাগ	বর্ষা	” ”।
”	নট্টনারায়ণ	হেমন্ত	” ”।

সর্ব্বশেষে বিধান দেওয়া হইয়াছে সে সুখপ্রদা সর্ব্ব ঋতুতেই যথেচ্ছা অর্থাৎ সকল রাগ রাগিণীই গান করিবে। যথা :—

"যথেচ্ছয়া বা গাতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদা ॥"

—ইতি সোমেশ্বরমতম্। সঙ্গীতদর্পণম্।

রাগরাগিণী গাইবার সময় সম্বন্ধেও শ্লোক আছে। তবে এখন যেরূপভাবে রাগ রাগিণী গাহিবার সময় প্রচলিত হইয়াছে তার সঙ্গে পূর্ব্ব নিয়মের কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীত চন্দ্রিকা নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বহু রাগ রাগিণীর ঠাটসহ গাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা এইস্থলে আর প্রদত্ত হইল না। (ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(দ্বিতীয় গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মিশ্র খাম্বাজ——দাদ্‌রা।

ছায়া।

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদ'র উপকূলে।
জানি না ত, প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ চাঁদের হাসি;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী।

১´ ০ ১´ ০
সা II { -া ন্ধ্া ন্া। সা -র্া র্া I -া ন্সা সসা। পা মা -গা I
আ য় রে॰ ব স ন্ ত • ও॰ তোর্ কি র •

১´ ১´ ‖ ০
I -র্া সন্া সা। র্া পা মা I গা -া -া। (-া -া সা) }।
ণ্ মা॰ খা। পা খা তু লে • •। • • "আ"

---

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "নারায়ণের" প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

o ১´ o ১
। -া -া জ্ঞা I {জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞ পা পা -া I জ্ঞপা -ধপা মগরা।
• • নি য়ে আয় তোর্ ন্ ত ন্ গা• •• নে••

o ১´ o ১´
। রা রগা -পমা I -গা রসন্া সসা। রা পপা মা I গা -া -া ।
ন্ তু• •• ন্ পা•• তায় ন্ তন্ ফু লে • •

o o
।(-া -া জ্ঞা)} I -া -া সা II
• • 'নি' • • "আ"

অন্তরা।

o ১´ o ১´
। -া -া রা II {গা পা পা। ধধা ধা -ণা I ণা ধা -া ।
• • শু নি প ড়ে প্রে ম • ফাঁ দে •

o ১´ o ১´
। -া -া পজ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । পা জ্ঞপা -ধা I পজ্ঞা পা -া ।
• • তা• রা স ব হা সে• • কাঁ• দে •

o o ১´ o
।(-া• -া রা)} I -া -া জ্ঞা I {জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । পা পা পা I
• • 'শু' • • আ মি শু ধু কু ড়া ই

১´ o ১´ o
I জ্ঞপা -ধপা মগরা। রা রগা -পমা I -গা রসন্া সসা। রা পা মা I
হা• •• সি•• সু খ• •• • ন•• দীর্ উ প কু

১´ o o
I গা -া -া। (-া -া জ্ঞা)} I -া -া সা II
লে • • • • 'আ' • • "আ"

সঞ্চারী।

o ১ o ১´
। -া -া প্া II{প্া ধ্া ন্া। ধ্ন্া -ধ্ন্া সা I সা সা -া ।
• • জা নি না ত প্রে •• ম কি সে •

```
   ০          ১´          ০          ১´
। -া  -া  ন্‌া I সা  রা  গা । রা  পা  মা I গা  -া  -া  ।
  •   •  চা    হি  না  সে    ম   ধু  বি    যে  •   •

   ০          ০          ১´          ০
। (া  -া  প্‌া ) } I -া  -া  হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা পা পা I
  •   • 'জা'     •   •  আ      মি  শু  ধু     বে ড়ি য়ে

   ১´          ০          ১          ০
I হ্মপা -ধপা মগরা । রা রগা -পমা I -গা রসন্‌া সা । রা গা হ্মা I
  বে০ ••  ড়া০ই  নে চে•  ••     •  গে  য়ে   প্রা ণ খু

   ১´          ০          ০
I পা  -া  -া  । ( -া -া হ্মা ) } I -া  -া  পা I
  লে  •   •      •  • 'আ'       •  •  নি
```

আভোগ।

```
   ১´          ০          ১´          ০
I { পা  ননা  ননা । র্সা র্সা নর্সর্রা I র্সা র্সা  -া । -া  -া  র্সা I
   য়ে আয় তোর   কু  সু  ম••     রা  শি  ০     •  •  তা

   ১´          ০          ১´          ০
I র্নর্সা না ধপহ্মা । পা  না  ধা I নর্সা না  -া । ( -া -া পা ) } I
  রাস্‌  কি  র০ণ্‌   চাঁ  দে  র    হা•  সি  •     •  • 'নি'

   ০          ১´          ০          ১´
I -া  -া  হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা  পা  পা I হ্মা  পা  -া ।
  •   •  ম      ল  য়ে  র    ঢে  উ  নি    য়ে  আ  য়্‌

   ০          ১´       •• ০          ১´
। গা  গা  পমা I -গা রন্‌সা সসা । রা  পা  মা I গা  -া  -া ।
  উ  ড়ি  য়ে•    •  দে••  এই   এ  লো  চু    লে  ০  •

   ০          ০
। ( -া -া হ্মা ) } I -া  -া  সা II II
  •  • 'ম'        •  •  'আ'.
```

এ স্বরলিপি একতালা তা'লেও বেশ বাজাইতে পারা যায়। সে অবস্থায় একতালার তৃতীয় আঘাতের তৃতীয় মাত্রা হইতে ধরিতে হইবে।—লেখিকা।

নারায়ণের নিকষমণি

মানসী—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী লিখিত, অন্নদা বুক ষ্টল হইতে প্রকাশিত, আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ গ্রন্থ। ইহাতে একটি ছোট গল্প আর একটী ভ্রমণ কাহিনী আছে, গল্পটীর নামেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্পের ঘটনা আধুনিক ধরণের বটে। অপ্রত্যাশিতভাবে নায়ক নায়িকার মিলন—কেহ কাহাকেও চেনেন না—তারপর অলক্ষিতে ভালবাসা—তাহার পর বিবাহের প্রস্তাব (অবশ্য দুই তিনবার না এর পর) তাহার পর আলাপ, তাহার পর বিরহ, তাহার পর হা হুতাশ, তাহার পর নৈরাশ্য—বিবাহ হইল না। ইতি সমাপ্ত। পুরীর ভ্রমণ কাহিনী সুখপাঠ্য হইয়াছে। বর্ণনাভাগে যথা—মাঝে মাঝে অসঙ্গতি আছে, ভ্রমর কৃষ্ণ চুলের গোছা চোখে মুখে লুটোপুটি খাচ্ছে," তারপর পট পরিবর্ত্তন করিয়াই লেখক কহিতেছেন 'যাবার সময় দোলান বেনীটা তার পিঠে কয়েকটা আছাড় খেল মাত্র' কবি ভ্রাতারা বলিতে পারেন কিরূপে উহা সম্ভব হয়? আর এক স্থানে লেখক বলিতেছেন '৫ টায় ত ট্রেণ ছাড়বে ইত্যাদি' তারপর 'তখন বেলা ৫টা…গার্ড হুইসেল দিলেন…লাফ দিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িয়া বসিলাম।" ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। ভাল ছাপা কাগজ ও মলাট সুন্দর।

স্বরাজ সাধন—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভারত জুড়ে যে প্রচণ্ড আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তার একটা পরিচয় দেবার জন্য এই পুস্তিকাখানি লেখা হয়েছে। এর—বিষয় নির্ব্বাচন দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে—নবযুগের আহ্বান, অসহযোগিতা জাতির প্রাণের কথা, অসহযোগিতার অর্থ ও কারণ, পাঞ্জাবের কথা, খিলাফতের কথা, অন্নকষ্ট ও বস্ত্রের অভাব, মহাত্মা গান্ধী, অস্ত্রধারণ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও স্বাধীনতা-লাভের অন্তরায়, মহাত্মার বাণী, অসহযোগিতা আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতার পথ, এবং আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতা—এই কয়টি বিষয় এই পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। আমাদের মনে হয় এখানি পড়লে মোটামুটি বর্ত্তমান আন্দোলনের

ধারাটিকে বুঝতে সহজ হবে। সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত হয়ে বইখানি আরও সুখপাঠ্য হয়েছে। আমরা এ পুস্তক খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

যাত্রী

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

অসীম পথে চলেছি যবে
ফির্‌ব না আর ফির্‌ব না,
অকূল মাঝে ভেসেছি যবে
ভিড়্‌ব না আর ভিড়্‌ব না।

পথের মাঝে থাকনা কাঁটা,
সাগর জলে ঢেউয়ের ঝাঁটা
দুঃখ আসুক ঘিরে আমায়
টল্‌ব না কো টল্‌ব না।

শিকল যত পড়্‌বে পায়ে
আসবে বাধা যত,
মুক্তি তরে চিত্ত আমার
উঠবে নেচে তত।

বিঘ্ন বাধা আস্‌বে যত,
নীরব হ'য়ে সইব তত,
শত বাধায় লক্ষ্য আমার
ভুলব না কো ভুলব না।

পিতলকে সোণা বলিয়া চালাইলে সোণার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটার ও জাত যায়। অথচ, সংসারে ইহার অসদ্ভাব নাই। যায়গা ও সময় বিশেষে হ্যাট মাথায় দিয়া খাতির আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটু-খানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে একদিকে এই খাতিরটাও যেমন ফাঁকি, মানুষটার লাঞ্ছনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্যগোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিয়া দেখানো এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয় মানুষ যখন নিজের দৈন্য জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী দাওয়া নাই। এই অসত্য অধিকার যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের স্তূপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে; আজ এ দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার যো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে সুরু করিয়া কনেষ্ট-বল পর্য্যন্ত সবাই বলিতেছেন সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও—নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এম্‌নি। অর্থাৎ অত্যাচার অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজা-পুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এম্‌নিটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? দুই জন পাকা ও অত্যন্ত হুঁসিয়ার এডিটারকে একদিন প্রশ্ন করিলাম, একজন মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন ওটা ভাগ্য। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে সিডিশন হয়না—ওটা বিগড়াইলেই হয়। আর একজন পরামর্শ দিলেন, একটা মজা আছে। লেখার গোড়ায় 'যদি' এবং শেষে "কি না?" দিতে হয়, এই দুটা কথা নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে আর সিডিশনের ভয় থাকে না। হবে ও বা, বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম—কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শও যেমন দুর্ব্বোধ, অপরের উপদেশও তেম্‌নি অন্ধকার ঠেকিল। লিখিয়া লিখিয়া নিজেও বুড়া হইলাম, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক মতই কোন একটা বিষয় ন্যায়সঙ্গত কি না স্থির

করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি', ও 'কিনা', বিকীর্ণ করিয়া সিডিশন বাঁচাইব ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্য-বাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সত্যবাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি বা কেহ লেখে ছাপা ওয়ালা ছাপিতে চায় না,—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শতকোটী নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয় রাজ রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁদে ফাঁদে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিক্ষত, বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁদ কাটিতে সুরু করে তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে তাহার মহত্ব বাড়ে না এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতায় দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূচ বিঁধিতে থাকে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আরও একটু পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]   [চৈত্র, ১৩২৮

আলোর উদ্দেশে

[দরবেশ]

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
ঘুচাও তোমার বর্ণেগন্ধে অন্ধকারের কালো।
এই ভারতের দেশে দেশে,
মরণ-বরণ ঘুমের শেষে,
কণক কিরণ দেখাও হেসে,—
জীবন-জাগন ঢালো।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিটোল ছন্দে
বাজাও তোমার বাঁশী ;
ঘুমভাঙাদল নয়ন মেলে
খেলুক হাসি হাসি।
রঙীণ ডানার পরশ পেয়ে,
তরুণ প্রবীণ চলুক ধেয়ে ;
পথের বিপুল আঁধার ছেয়ে
হোমের আগুন আলো।

বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাষা বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস।

(১) পাশ্চাত্য প্রদেশে ভাষা বিজ্ঞান চর্চা
(২) প্রাচ্য দেশে ভাষা বিজ্ঞান চর্চা
(পুরাতন ও আধুনিক)

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় ভাষাসমূহ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন সেই সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিব।

(১) ভাষা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আধুনিক কালেই হইয়াছে। সেকালের ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার চর্চা ছিল না বলিলেই হয়। গ্রীকজাতি ব্যাকরণের ধার ধারিত না। অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা অবশ্য তাহারা খুব করিত। পরের ভাষা শিক্ষা করা তাহারা নিজেদের সম্মানের হানিকর বলিয়া মনে করিত। অন্য সকলের ভাষাই অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রথম গ্রীক ব্যাকরণ একজন রোমীয় কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। ইংরেজ পণ্ডিতগণ এবিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু জার্ম্মণরা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং এখনও পুরোবর্ত্তী আছে।

বপ্ (Bopp) নামক জার্মাণ পণ্ডিত তুলনামূলক ব্যাকরণের (comparative grammar) প্রথম রচয়িতা! তিনি ১৭৯১—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সংস্কৃত, জৈন, গ্রীক, লাতিন, জর্মাণ, প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দো—ইউরোপীয় ভাষার তুলনা মূলক ব্যাকরণ তিনিই লিখিয়া যান।

গ্রীম্ (Grimme, 1786—1859) আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত তিনি ধ্বনিতত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূল সূত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে আবিষ্কার করিয়া যান। সুবিখ্যাত Grimm's Law ইহারই আবিষ্কার।

পট্ (Pott, 1802—1887) নামে জার্মাণ পণ্ডিত অর্থ সম্বন্ধীয় আলোচনার সূত্রপাত করেন (Etymological Studies)।

ম্যাক্‌সমুলর (Maxmnller) যদিও বিলাতে বসবাস করিয়াছিলেন—কিন্তু জাতিতে তিনি জার্ম্মাণ ছিলেন।

ম্যাক্‌সমুলর ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চাকে লোকের মধ্যে বিস্তার করেন। তিনি এবং পাউল (Paul) নামক জার্মাণ পণ্ডিত "ভাষার ইতিহাস" (History of Language) অংশের আলোচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

শব্দার্থ তত্ত্বের (Semantics) আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্বে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ফরাসী অধ্যাপক ব্রেআল (Breal) ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) বিষয়ে গ্রিম, বার্ণার, গ্রাসমাণ, ফরচুনাটফ্ (Grinmm, Verner, Grassmann, Fortunatov) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরচুনাটফ্ রুশীয় ছিলেন। ইঁহারা ধ্বনিতত্ত্বের এক একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গ্রিমের মূল সূত্রে যে সমস্ত দোষ ছিল, বার্ণার, গ্রাসমান, ফরচুনাটফ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত সূত্রের সাহায্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। বুলর (Biihler) নামক জার্মাণ পণ্ডিত ভারতীয় অক্ষরের ইতিহাস (Indian Paleography) রচনার জন্য অমর হইয়া গিয়াছেন। তুলনামূলক বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির (comparative Syntax) আলোচনায় ডেলব্রুক (Delbriick) নামক আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। শুনিয়াছি অধ্যাপক ডেলব্রুকই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিজের মাতৃভাষার মতই অপর একটি ভাষায় দখল লাভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ মাতৃভাষার মত অন্য ভাষার সমান অধিকার সম্ভবপর হয় না। তুলনামূলক বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির আলোচনায় এরূপ জ্ঞান খুবই সাহায্যপ্রদ।

শব্দ সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস আলোচনায় জার্ম্মান পণ্ডিত শ্রাডার (Schrader) সবিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চার আগে অনেক গলদ ছিল। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সর্ব্ব প্রথমে জর্ম্মাণির নব-বৈয়াকরণিকেরা প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা উপহাস করিয়া ইঁহাদের নাম দেন Jimg, grammatikers —the Neo-grammarians অর্থাৎ "ছোক্‌রা বৈয়াকরণিকের দল"। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর লেসকিয়েন, ষ্টাইনটাল, পাউল, ব্রুগমান, ডেলব্রুক (Leskien, Steinthal, Paul, Brugmann, Delbriick) প্রভৃতি এই

দলের লোক প্রচার করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধ্বনি বিজ্ঞানের সূত্রাদ কার্য্য করে। পূর্ব্বে সূত্র গুলির ব্যতিক্রম ব্যাখা না করিয়া গোঁজা মিল দেওয়া হইত। ইহাঁরা এমন ভাবে সূত্র গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষায় একটী শব্দ এইরূপ হইলে গ্রীক ভাষায় এইরূপ ধ্বনি বিশিষ্ট হইবে—হইা বলা সম্ভবপর হইয়াছিল। হয় তো পরে গ্রীক ভাষায় ঐরূপ শব্দ হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকের বাণী সফল করিয়াছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড়ী মূলভাষা হইতেই আমাদের ভারতীয় ভাষা-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাই এই দুই প্রধান বিভাগের আলোচনাকারী পণ্ডিতগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে প্রধান বিশেষজ্ঞ জার্ম্মাণ পণ্ডিত ব্রুগমান এবং ফরাসী পণ্ডিত মেইয়ে (Meillet)। ব্রুগমান জীবিত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভারত সংশ্লিষ্ট দুইটি প্রধান শাখার মধ্যে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষায় গোল্ডনার, বার্থলোমাই ও জ্যাকসন (Goldner, Bartholomae, Jackson) বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গোল্ডনার ও বার্থ-লোমাই জার্ম্মাণ—জ্যাকসন্ আমেরিকান হইলেও জার্ম্মাণিতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভারতসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় প্রধান শাখার ইন্দো-আর্য্য ভাষা যাহা হইতে আমাদের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও বর্ত্তমান চলিত ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। পিশেল, উলেনবেক্, স্পাইয়ার, টুম্, বাকারনাগেল, টমাস (Pischel, Speijer, Uhlenbeck, Thumb, Wackernagel. Thomas) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শাখায় বিশেষ পারদর্শী।

বিম্‌স্, হার্ণলে, গ্রিয়ারসন্, এণ্ডারসন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বাঙ্গলা ও তৎসংশ্লিষ্ট আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা করিয়াছেন।

দ্রাবিড়ী শাখা সম্বন্ধে ডাঃ কলডয়েল (Caldwell) ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (Srinivas Aiyanger) মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

(২) প্রাচ্যদেশে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চ্চা।

(ক) পুরাতন।

(খ) আধুনিক।

প্রাচ্যদেশ বলিতে এখানে আমাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিব।

চীনদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরব প্রদেশে অতি পুরাতন কাল হইতেই ভাষা বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতেই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেই যাস্ক বৈদিক সংস্কৃতের অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-রচয়িতা মহর্ষি পাণিনিকে ভাষাবিজ্ঞান জনক বলিলেও চলে কারণ তিনিই প্রথমে ধাতুবাদের (Theory of roots III. 1, 91) অবতারণা করিয়া যান। পরবর্ত্তী যুগেও শত শত বৈয়াকরণিক ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শেষে নবদ্বীপের নব্য ন্যায়ের কূটতর্কের ভিতর ভাষাবিজ্ঞান জড়াইয়া মরে।

বর্ত্তমান কালে রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ভাণ্ডারকর, পাণ্ডুরং দামোদর গুণে, ডাঃ ইরাক সোরাবজী তারাপুর ওয়ালা প্রভৃতি সুধীবর্গ ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এখন বাঙ্গলা ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বলিব। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের History of the Bengali Language (বাঙলা ভাষার ইতিহাস) বাঙলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সখ করিয়া যাঁহারা বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের কতকগুলি লেখাও অবধানযোগ্য।

বৈজ্ঞানিকভাবে যাঁহারা বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তিনি বাঙলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বাঙলা-ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ লিখিবার চেষ্টায় মৌলভী মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় হাত দিয়াছেন।

বাঙলাঅক্ষরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি চমৎকার পুস্তক রচনা করিয়াছেন। শব্দার্থ তত্ত্বের আলোচনায় বর্ত্তমান লেখক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগসম্বন্ধে বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা এখনও পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই।

দুঃখের বিষয় বিদেশের পণ্ডিতগণ আমাদের ভাষার আলোচনা লইয়া জীবনপাত করিতেছেন, আর আমাদের দেশের সুধীবর্গের এদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। জ্ঞানের জননী ভারতের সন্তান আজ মাতৃভাষার আলোচনার জন্যও পরমুখাপেক্ষী এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে। এ লজ্জাভাঙার সূত্রপাত হইয়াছে, আশা করি অচিরে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে।

অন্নপূর্ণা

[শ্রীসুনীতি দেবী]

(১)

যখন বৃদ্ধ রামতনু ভট্টাচার্য্য তদীয় একমাত্র দুহিতার বিবাহের ভাবনায় সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, এমনি সময় একদিন তাঁহার বাল্যবন্ধু জমিদার কালীপদ মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুলালয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বাড়ীর নিকটে ছিল। এখন মাত্র কয়েকটা ছাড়া ভিটা ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই। পুত্রহীন মাতামহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীপুরে আসা যাওয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে তিনি আজ তথায় আসিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আজ কত প্রভেদ। তথাপি জমিদারমহাশয় বাল্যসৌহার্দ্দ্য স্মরণ করিয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিবার সময় ভট্টাচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই দেখিয়া কালীপদ বলিলেন, "কি ভায়া, তোমার কালীপদকে কি একেবারে ভুলে গে'ছ?"

ভট্টাচার্য্য জমিদার মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া, মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া "আসুন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কালীবাবু সহাস্যে বলিলেন, 'আসুন' কি ভাই? আমাকে 'আপনি' বল কেন; আজ ছোট বেলার মত দুজনে একসঙ্গে বসিয়া নুন লঙ্কা দিয়া ভাত খাব, এই আশায় এ পথে আসিয়াছি। তোমার সেই কালু ভিন্ন যদি আমাকে আর কিছু ভাব, তবে আমি এই বেলাতেই প্রস্থান করি।" ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, এ সেই কালুই বটে!

পরিধান বস্ত্রাদিও যে ভট্টাচার্য্যের অপেক্ষা বড় ভাল, তা নয়; তবে পরিষ্কার বটে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন মেয়েকে ডাকিলেন, "অন্নপূর্ণা।" অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আসিতে গিয়া নূতন লোক দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইল। কালীবাবু বলিলেন, "এস মা, এস। লজ্জা কিসের? আজ অন্নপূর্ণার রাঁধা অন্ন খাইতে আসিয়াছি।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মা, তাড়াতাড়ি রান্না করগে। আমার বন্ধু এখানে খাবেন।"

অন্নপূর্ণা রান্নার যোগাড় করিতে গেল। গাছের বেগুন, লাউ ইত্যাদি তুলিয়া সুক্ত, ঘণ্ট, ভাজা, দা'ল প্রভৃতি খুব শীঘ্র পাক করিয়া পিতাকে ডাকিল। দুই বন্ধু একত্র ভোজনে বসিলেন। কালীবাবু বলিলেন, "ভাই, আজ যেন বাস্তবিক অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়াছেন। এমন রান্না তো বাড়ীতে কখনো খাইনে। ভেবেছিলাম নুন-লঙ্কা দিয়ে ভাত খেয়ে যা'ব। তা' মা যে রান্না করেছেন, একটুও পাতে রাখা হ'বে না। কিন্তু ভাই, আমার একটা কথা,—এ মেয়েটি আমাকে দিতে হবে, রোজ রাঁধবার জন্যে। এ রান্না খেয়ে পাচকের রান্না রুচ্‌বে না কিন্তু।" রামতনু প্রথমে ভাবিলেন ঠাট্টা। পরে যখন কালীবাবু বলিলেন, "আমার ছেলে সতীশ বি-এ পড়িতেছে। তাহাকে লইয়া আমি মাঘ মাসে আসিয়া তোমার মেয়েকে লইয়া যাইব।" তখন ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, সবই তোমার ইচ্ছা! তুমি যে ভার দিয়েছ, তুমিই তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবে। তোমাকে ভুলিয়া যাই, তাই এত ভাবনা।" কালীবাবু অন্নপূর্ণাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিলেন, "ভাই, বিবাহের আয়োজন কর; এই পৌষ মাসান্তে মা আমার গৃহে যাইবেন।"

(২)

জমিদার গৃহিণী তরকারি কুটিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মা, কর্ত্তা আসিয়াছেন।" গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "উঠতে হ'বে না, বস। একটা শুভ খবর আছে।" গৃহিণী সোৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

কর্ত্তা। সতীশের বিয়ে স্থির করেছি।

গৃহিণী। কোথায়? কত টাকা দেবে?

কর্ত্তা। বাঃ! আগেই টাকার কথা? তোমার কি অভাব আছে নাকি? বিশ হাজার টাকার উপরে তোমার জমিদারীর আয়, তবুও—

গৃহিণী। তা বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, টাকা না নিলে লোকে বলবে ছেলের কি খুঁত আছে। তাই বিনে টাকায় বিয়ে দিল। তা' কিছুতেই হ'বে না। সে দিন রামের মা আমাকে বলিতেছিল, "দিদি, তোমার ছেলের একখানা পাশের দাম, দু'হাজার টাকা।" টাকা দিতে বলিও।

কর্ত্তা। টাকা দেবে কোত্থেকে? তাদের অবস্থা তো তেমন নয়। সেকি টাকা দিতে পারে?

গৃহিণী। না, দীন-দরিদ্রের মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ভাল টাকাই না দিল, বড় লোকের মেয়ে হ'লেও ত হ'ত। লোকে বলিবে কি?

কর্ত্তা। আমি সব স্থির করিয়া আসিয়াছি, আর বকাবকি করিও না। বিবাহের যোগাড় করগে।

ইহা বলিয়া কর্ত্তা উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী তো রাগে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "যেমন কপাল, তেমনই ঘটে। কর্ত্তার যে কি বুদ্ধি হইয়াছে,—মান-অপমান জ্ঞানও নাই!"

(৩)

দশ দিন হইল অন্নপূর্ণার বিবাহ হইয়াছে। শ্বশ্রূ বৌ দেখিয়া খুসী হন নাই। দরিদ্রের মেয়ে, একখানা গহনামাত্র দেয় নাই। সে সব দুঃখ তো আছেই। ফুলশয্যার দিন কালীবাবুর অত্যন্ত জ্বর হয়, আজ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কবিরাজ বলিয়াছে রাত্রি কাটিবে না। গৃহিণী দিনরাত্র বালিকাবধূর প্রতি রোষাগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। অন্নপূর্ণা কেবলই কাঁদে। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়াছে, যাঁহাকে ছাড়া সংসারে সে আর কাহাকেও জানিত না, সেই পিতার বিচ্ছেদ তাহার প্রাণে অত্যন্ত লাগিয়াছিল। গৃহিণী কঠোর স্বরে বলিলেন, "দিনরাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিও না। এমন অপয়া মেয়েওতো দেখি নাই। ঘরে আসিতেই আমার সংসার ভাঙ্গিবার যো হইয়াছে।" বালিকা ভয়ে ভয়ে চুপ করিত বটে, কিন্তু চোখের জল বারণ মানিতে চাহিত না।

দাসী আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা বৌমাকে ডাকিতেছেন।" এবং অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ অন্নপূর্ণাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, দাসী চলিয়া গেল। এবার পরিষ্কার কণ্ঠে কালীবাবু ডাকিলেন, "সতীশ।" সতীশ পাশের ঘরে ছিল, ডাকিবামাত্র পিতার নিকট উপস্থিত

হইল। বৃদ্ধ বলিলেন, "সতীশ, তোমাদের উভয়কে একত্র দেখিব, তাই ডাকিয়াছি। মা অন্নপূর্ণা, নরম নরম হাত দুখানি কপালে বুলাইয়া দেও তো মা।" অন্নপূর্ণা হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধ সতীশকে বলিতে লাগিলেন, "বড় লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলাম। দুঃখ এই, ভাল করিয়া দেখিতেও পারিলাম না। মা আমার আজন্ম দুঃখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা, সাধ ছিল মাকে মনের মতন সাজাইব, স্নেহের অভাব ঘুচাইব, অন্নপূর্ণা আমার গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিবেন। আমি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব। সে সাধ পূরিল না, আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম। আমার আশা, তোমরা মায়ের দুঃখ ঘুচাইবে। আর এক কথা। পিতামাতা কিম্বা যে কোন গুরুজনই হউক না, কাহারও আদেশে ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তোমার মাকে এখন একবার আসিতে বল।" কথা শেষ না হইতে গৃহিণী সে ঘরে ঢুকিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম, অন্নপূর্ণার মাতার অভাব তুমি ঘুচাইও। সতীশ তোমার আজ্ঞাধীন ছেলে, যেন তাহাকে এমন কোন আদেশ করিও না যাহাতে তাহাকে ন্যায় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া একটু জল চাহিলেন। সতীশ মুখে বেদানার রস দিতে গেলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আর ওসব কেন, গঙ্গাজল দেও।" সতীশ গঙ্গাজল দিয়া একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে গেলেন। এই ৭।৮ দিনের পর আজ বেশ জ্ঞান হইয়াছে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শেষবার জ্বলিয়া এখনই হয়তো নিবিয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় সতীশের মন অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু গৃহিণী ভাবিলেন, বুঝি অবস্থা ভাল হইয়াছে। ডাক্তার প্রভৃতি অনেক লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৃহিণী বধূকে লইয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেরই চক্ষে জল, কর্ত্তার ব্যবহারে সকলেরই তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল। কর্ত্তা সকলকে বলিলেন, "আমাকে যাত্রা করাও, ভগবানের নাম শুনাও, আর দেরী নাই।" সতীশ সাশ্রু চক্ষে পিতার ললাটে বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকায় রামনাম লিখিয়া দিলেন। শিবদৃষ্টি দেখিয়া গৃহের বাহিরে আনিয়া তারাব্রহ্ম রামনাম শুনাইতে লাগিলেন। সজ্ঞানে ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে ধার্ম্মিকবরের প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল।

(৪)

যখন রামতনু ভট্টাচার্য্য অন্নপূর্ণাকে নিতে আসিলেন, মনে মনে কত আশা

অন্নপূর্ণা কত আদরে, কত উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। আহা! মেয়ে কখনও কোন উৎসব বা সুখের মুখ দেখে নাই। নিতান্ত ভগবান্ দয়া করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! হয়তো যাইয়া দেখিবেন, অন্নপূর্ণা যেমন করিয়া পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত, তেমনি ভাবে কালীবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাঁহার স্নেহে হয়তো সে পিতার অভাব অনুভব করিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ী প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন উৎসব বা আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই, সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া। রামতনু জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তা কোথায়? শুনিলেন আজ দুই দিন হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, হায়! অন্নপূর্ণার জন্য বুঝি ভগবান্ আদর যত্ন লেখেন নাই! পরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সমস্ত বাড়ীটাই যেন শোকে মুহ্যমান। সতীশের মুখে তাঁহার হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা যেন প্রকাশিত হইতেছে।

রামতনু বেহানকে কহিলেন, "আমি না জানিয়া অন্নপূর্ণাকে নিতে আসিয়াছি। তা' এ অবস্থায় আর কেমন করিয়া লইয়া যাইব। বেহাই এত শীঘ্র যে তোমাদের শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই।" সতীশ বিশেষ কিছু বলিল না। রামতনুর আহারাদির ব্যবস্থা অন্য ব্রাহ্মণ বাড়ীতে করা হইল; অশৌচ, এ জন্য এ গৃহে তাঁহার আহার করা হইবে না।

সতীশের মার কিন্তু অন্নপূর্ণাকে রাখিতে সাহস হইতেছে না। এমন অপয়া মেয়ে, গৃহে আসিতেই ত শ্বশুর গত হইয়াছেন। সতীশের যদি উহার গায়ের বাতাসে কোন অমঙ্গল হয়? ভাগ্যি এ যাবৎ তাহার সতীশের সংস্পর্শ ঘটে নাই! তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "আপনি আপনার মেয়েকে লইয়া যান, এমন ডাইনী মেয়েকে রাখিতে আমার সাহস হয় না।" কালীবাবুর অভাবে, এ বাড়ীতে যে অন্নপূর্ণার কি রকম আদর, ব্রাহ্মণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। যাহা হউক, ভগ্ন হৃদয়ে কন্যাকে লইয়া তিনি তথা হইতে যাত্রা করিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর গৃহ হইতে অন্নপূর্ণার অন্ন উঠিল।

(৫)

দুই তিন দিন পরে সংবাদ আসিল, রামতনু ভট্টাচার্য্যের মৃত দেহ পাওয়া

গিয়াছে, সম্ভবতঃ নৌকা-ডুবি হইয়াছিল। মেয়েটার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এ সংবাদ সকলেই শুনিল।

রামের মা আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দিদি, শুনিলাম, বৌটার বাপের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সে-ও মরিয়াছে। বলিলে কি বল্‌ব দিদি, সেই মরা ত মরিল, আর কিছুদিন আগে মো'লে হয়তো তোমার এ সর্ব্বনাশ হইত না।" গৃহিণী নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। রামের মা বলিতে লাগিলেন, "তা তোমার দুঃখ হতে পারে, তোমার দয়ার শরীর কিনা। আমি কিন্তু দেখিয়াই বলিয়াছি মেয়েটার লক্ষণ তত ভাল নয়। অত ছোট কপাল কি ভাল হয়? আমার মেয়ের কপাল খানা দেখিয়া সে দিন গণক ঠাকুর কত ভাল বলিলেন, যেমন বড় উঁচু কপাল তেমনি বড় ও উঁচু ঘরের বৌ হ'বে। আমি বলেছিলাম, তেমন বেশী টাকা তো নাই যে বড় ঘরে বে হ'বে। গণক বলিল, এই জমিদার বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া সম্ভব। তখন অসম্ভব ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখছি ভগবানের ইচ্ছায় সম্ভব হইতেও পারে। কর্ত্তা তো বিনে টাকায় আমার চেয়েও দরিদ্রের ঘরের মেয়ে এনেছিলেন।"

গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না। ইতিমধ্যে বাটীর একটি পরিচারিকা সেখানে আসিয়াছিল। বৌয়ের জল-মগ্ন সংবাদ শুনিয়া বলিল, "অমন বৌ কিন্তু আর জুটিবে না। যখন গহনাগুলি ও বেনারসী পরাইয়া দিয়াছিলেন, যেন দুর্গা-প্রতিমার মতই দেখাইতেছিল। উঠানখানি যেন আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আহা! কথাগুলিও যেন"—

পরিচারিকার কথায় বাধা দিয়া রামের মা বলিলেন, "ওর মত সুন্দর মেয়ে ঢের মিলবে। বড় ফ্যাকাশে রং যেন চোখ ধরে। আমার মেয়েকে দেখিয়া অনেকেই বলে, মেয়ে-মানুষের এমন বর্ণই ভাল! বেশ লক্ষ্মীর শ্রী।" গৃহিনীকে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি গহনাগুলি কি সব দিয়াছিলে?" গৃহিণী কহিলেন, "আমি ভাবিলাম এ ক'দিন তো আর গহনা পরবে না; তাদের ভাঙ্গা ঘরে চোরে লইয়া যাইবে, তাই সঙ্গে দিই নাই। তখন তো ভেবেছিলাম' আবার এই খানেই আসতে হবে। এমন যে হ'বে তা কে জানত। কেবল কর্ত্তা সতীশ ও বৌয়ের জন্যে এক-রকম নূতন ফ্যাসানের আংটী গড়িয়েছিলেন, সেই আংটীটা ছিল।" রামের মা বলিলেন, "তা ভালই করেছিলে, দিদি। বৌতো গিয়াছে, গয়নাগুলোও যেত। সেও পরত না, তোমারও জিনিষ নষ্ট হ'ত।"

এমন সময় কর্ম্মচারী আসিয়া ডাকিল, "গিন্নী মা, এদিকে আসুন, কথা আছে।" গৃহিনী উঠিয়া গেলেন।

মহা সমারোহে কর্ত্তার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, তিনি যেমন সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার কার্য্যও তেমনি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কাঙ্গালীরা দুইহাত তুলিয়া সতীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বলিলেন সতীশ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে। সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া গেলে সতীশ মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

(৬)

সতীশ কলিকাতায় পৌছিয়া তাঁহার বন্ধু বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। পিতৃশোকে মন যেন বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মানসিক অবসাদ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার আশায়, বিনোদের আসার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই তাহার বাসায় গেলেন।

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "কি ভায়া, এবার ফিরিতে পারিলে তো? আমি তো ভাবিয়াছিলাম, বৌদিদি বুঝি আর তোমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিবেন না।" বিনোদ বিবাহ পর্য্যন্ত জানিত। তৎপরে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সব কিছুই জানিত না।

সতীশ তখন সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিনোদলালকে বলিলেন। তৎপর কহিলেন, "ভাই, যেদিন আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব এ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে এক মুহূর্ত্তও যেন শান্তি পাইতেছি না। প্রাণের কি যে হাহাকার করিতেছে, তাহা মানুষকে বলিয়া বুঝাইতে পারি না। যিনি অন্তর্য্যামী তিনি ভিন্ন আর কেহ এ প্রাণের যাতনা বুঝিবে না। হৃদয় ভার অসহ্য বোধ হইতেছিল, তাই এখানে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমাকে দেখিয়া তোমার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া, প্রাণে একটু শান্তিবোধ হইতেছে।"

বিনোদ সতীশের কথাগুলি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার অন্য কোন কথা-বার্ত্তা হইয়াছে কি? তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি?"

সতীশ কহিলেন, "কথা বলিবার সুযোগ আর ঘটিল কৈ? ফুলশয্যার রাত্রে যখন শুইতে গেলাম, চাকর আসিয়া বলিল কর্ত্তা ডাকিতেছেন। গিয়া

দেখিলাম, বাবার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিয়া, তাঁহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার সামান্য পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। অনেক রাত্রে যখন তাঁহার একটু হুস হইল, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি এখনও শোও নাই? যাও, আমি এখন একটু ভাল আছি।' তাহার পর শয্যায় গিয়া দেখিলাম, অন্নপূর্ণা ঘুমাইতেছে। তাহার ঘুমন্ত মুখখানি যেন ফুটন্ত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে। তাহাকে আর ডাকিলাম না। পরে তাহার সে মুখখানি আর দেখি নাই। বাবার ব্যারামেই ব্যস্ত ছিলাম, আগেতো আর জানি নাই যে এই শেষ দেখা!"

বিনোদ বলিল, "মনে কর যদি ভবিষ্যতে কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাও, তবে কি চিনিতে পারিবে? তাঁহার শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন আছে?"

সতীশ বলিলেন, "যদিও আমি দেখি নাই, তবু যতটুকু দেখিয়াছি, আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া দেখিয়াছি। দেখি যদি, চিনিতে পারিব বৈকি? তাহার ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে একটী তিল আছে। কিন্তু আর কি তাহাকে ফিরিয়া পাইব? জানি না, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে কি ভাবে আছে। 'সে যে আজন্ম দুঃখের কোলে প্রতিপালিতা'—বাবার এই কথাটি কেবলই যেন আমার প্রাণে বাজিতেছে!"

বিনোদ বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, আবার দেখা হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইবে।"

সতীশ বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছি।"

(৭)

এই ঘটনার পর চারি বৎসর গত হইয়াছে। ৺কাশীধাম বিশ্বেশ্বরের দর্শন-মানসে এক রুগ্ন ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিয়াও মন্দিরে ঢুকিতে পারিতেছেন না। পরে অতিকষ্টে কোনরূপে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন, অমনি কতকগুলি লোক তাহার উপর যাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "মা অন্নপূর্ণা কোথায় তুই? তোর ভরসায় আমি যে এত কষ্টেও এখানে আসিয়াছি।"

একজন বিদ্রূপ-স্বরে বলিলেন, "অন্নপূর্ণা যেন তোমাকে কোলে করিয়া তুলিবেন!" এমন সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী দেবী মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিয়া বাস্তবিক ব্রাহ্মণকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন। একজন প্রবীন বয়সের লোক ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে

অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনার বাসা কোথায় বলুন। আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিতেছি।"

তৎপর তিনি ব্রাহ্মণের সমভিব্যহারে তাঁহার বাসায় চলিলেন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি ?"

"শশীভূষণ মিত্র।"

"এখানেই থাকেন ?"

"না, দুই-তিন দিন মাত্র আসিয়াছি। মুঙ্গেরে ওকালতি করি।"

"আপনি সদাশয় বলিয়া মনে হইতেছে। আর পাঁচ দিন পরে আপনি দয়া করিয়া একবার এখানে আসিবেন। বিশেষ কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে ?"

"হাঁ।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "মা আর সপ্তাহ মধ্যে আমার জীব-লীলা সাঙ্গ হইবে। তাই ভাবিতেছি, তোমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব! যিনি রক্ষা করিবার তিনি রাখিবেন;—মানুষ উপলক্ষ মাত্র। কাহাকেও চিনিতাম না। এই ভদ্রলোকটিকে ভগবান্ যথাসময়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি ভাবিতেছি, তোমাকে উঁহার কাছে রাখিয়া যাইব। বিন্দুমাত্র ভীত হইও না। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। তোমার দুঃখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর অল্পদিন পরে তুমি অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে। মা, তোমাকে পাইয়া সন্তানের সকল অভাব ভুলিয়াছিলাম। তুমি মায়ের মত যত্ন করিতে, সন্তানের মত ভক্তি করিতে। ভগবানের কৃপায় আর মাসখানেক পরে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।"

অন্নপূর্ণা নীরব রহিল। অশ্রুধারা তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া যেন শিশির-সিক্ত পদ্মফুলের মত তাহার সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ আবার কহিলেন, "মা, কাঁদিও না, তুমি গীতা পড়িয়াছ, ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ ক্ষুদ্র জীবন কতটুকু? সুখ-দুঃখ যাহাই আসুক না, কিছুতেই দৃক্‌পাত না করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহাতেই হৃদয়-মন সমর্পণ কর;—ধীরে ধীরে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হও। নিজেকে নিরাশ্রয়া মনে করিও না। যাহাকে দেখিবার কেহই নাই, তাহাকে

তিনিই দেখেন।—তাঁহাকে ভুলিও না। এইবার তোমার দুঃখের চরম। এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাইবে।"

ঠিক পাঁচ দিন পরেই শশীভূষণ মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "দয়াময় ভগবান্ আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আমার এ জীবনের আর দুদিন মাত্র বাকী আছে। দু'দিন পরে এ দেহের সম্বন্ধ ঘুচিবে। এ মেয়েটিকে কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় ভগবান্ আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ইহাকে আমি মেয়ের মতই মনে করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

(ক্রমশঃ)

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

তত্ত্বসমাসের সংক্ষিপ্ত সার

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

কোনো এক ব্রাহ্মণ সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্তি কামনা করিয়া মহর্ষি কপিলের শরণাপন্ন হইয়া বলেন—'মহর্ষি সংসারের ত্রিবিধ তাপে আমি নিতান্তই তপ্ত, কি করিলে এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব? শান্তির সন্ধান কোন্ পথে আমায় দয়া করিয়া বলিয়া দিন।" কপিলমুনি দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন, "প্রকৃতি পুরুষের বিবেকাখ্যানেই মুক্তি—অন্য পন্থা নাই। মৎকথিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের হৃদয়ঙ্গম হইলেই বিবেকজ্ঞান হইবে; শ্রবণ কর—।"

তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি প্রকার—

১। অব্যক্ত প্রকৃতি ২। অষ্টবিধ বুদ্ধি বা মহৎ। ৩। ত্রিবিধ অহংকার

৪-৮ পঞ্চতন্মাত্রা ৯-২৪ ষোড়শ বিকার যথা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন পঞ্চভূত। ২৫। পুরুষ—ত্রৈগুণ্য। শংকর। প্রতিশংকর। অধ্যাত্ম। অধিভূত অধিদৈবত। পঞ্চ অভিবুদ্ধি। পঞ্চ কর্ম্মযোনি। পঞ্চবায়ু। অবিদ্যা। অসক্তি, অতুষ্টি, অসিদ্ধি। তুষ্টি। সিদ্ধি। মূলিকার্থ অনুগ্রহসর্গ। ভূতসর্গ। বন্ধ। মোক্ষ। প্রমান। দুঃখ।

তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

১। প্রকৃতি—অব্যক্ত unmanifested ঘট পটাদি ব্যক্ত। **লক্ষণ** অনাদি এক অবিচ্ছিন্ন, অশ্রুত, অস্পর্শ, অনশ্বর, অনন্ত, অগন্ধ, অপরিণামী, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, অপ্রসূত। প্রসবী ; সর্ব্বসাধারণ।

অপর সংজ্ঞা—প্রধান ; ব্রহ্মন ; পুর ; ধ্রুব; অক্ষর, ক্ষেত্র, তমস্, প্রসূতি।

২। বুদ্ধি—অধ্যবসায়। ইহা নয় উহা নয় বিচার বৃত্তি। ইহার অষ্ট প্রকার যথা—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য—আসক্তি ; ঐশ্বর্য্য, অসক্তি। প্রথম চারি প্রকার হইল বুদ্ধির সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। শেষ চারি প্রকার তামসিক অভিব্যক্তি।

বুদ্ধির অপর সংজ্ঞা—মন, মতি, মহৎ, ব্রহ্মা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, শ্রুতি, ধৃতি ; প্রজ্ঞান সন্ততি ; স্মৃতি, ধী।

৩। অহংকার অভিমান (self-consciousness) বিজ্ঞান বা প্রত্যয়ের (perceptive object বা mental state.) সহিত আত্মার একত্ববোধ, আমি ইহা, আমি উহা, আমার ইহা, আমার উহা ইত্যাদি।

অহংকারের বিবিধ প্রকার—(১) বৈকারিক—সত্ত্বপ্রধান ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক।

(২) তৈজস্ রজপ্রধান, মন্দকাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৩) ভূতাদি—তমপ্রধান—গুপ্তকাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৪) সানুমান—অজ্ঞাতভাবে ভাল করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৫) নিরনুমান—অজ্ঞাতভাবে মন্দ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

এই পাঁচ প্রকার অহংকার বিধা—ভালমন্দ কাজের প্রবর্ত্তক।

cosmic creation এর সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই।

(৪) পঞ্চতন্মাত্রা—অহংকার হইতে উৎপন্ন। জ্ঞানমাত্র, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান—বিবিধ প্রকার জ্ঞানের মূল ভাব মাত্র

essence of percptions। **সংজ্ঞা (ক) অবিশেষ** অর্থাৎ undifferentiated শব্দ মাত্র, কিরূপ বা কিসের বা কি মাত্রার এ সব বোধ রহিত।

(খ) মহাভূত ভূতের আদিরূপ। (গ) অনু (ঘ) অশান্ত (ঙ) অঘোর (চ) অমুঢ়। এই সব নামের অর্থ বোধ হয় এই যে প্রত্যয় মাত্র essence of perception এখনো জীবের মনে নানা ভাব (সুখদুঃখাদি) আনিতে পারে না। যথা শব্দের মাধুর্য্য আছে, কর্কশত্ব আছে, তীব্রত্ব আছে এবং সেই অনুসারে প্রেয় বা হেয়; কিন্তু প্রথম অবিশেষ জ্ঞানে শিশুর আদি চেতনায় উহার কোনো ভাবান্তর ঘটাইতে এখনো পারে না। জীব এই অবস্থায় (অতি শৈশবে) অনুভূতির ভালমন্দ হেয় প্রেয় বিচার করিতে পারে নাই; কাজেই উহারা বন্ধনের কারণ হয় না, এই অর্থ না বুঝিলে অঘোর, 'অমুঢ়' 'অশান্ত' এসব সংজ্ঞার সার্থকতা দেখিনা। অব্যক্ত হইতে তন্মাত্রা পর্য্যন্ত এই অষ্ট প্রকৃতি এখনো প্রকৃতি নামে উক্ত, কেননা উহারাই কেবল 'প্রকুর্ব্বন্তি' প্রসবকারী—অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিকার প্রসূ সুতরাং সংসার সৃষ্টি আদি তত্ত্ব।

ষোড়শ বিকার।

দশ ইন্দ্রিয় মন ও পঞ্চভূত এই সকল ১৬ বিকার। শিশুর যত চেতনায়-বিশেষত্ব differentiation ঘটিতে থাকে ততই বহির্জগৎ বোধ বাড়িতে থাকে। রূপরস শব্দাদির প্রত্যয় যখন হয় তখন কোথা হইতে হয়, কি উপায়ে হয় কোন যন্ত্রে এই বোধ ঘটে কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম বুদ্ধিসঞ্চারে এই মাত্র হয় চেতনা ও তাহাতে প্রতিফলিত অনুভূতি; শব্দ হইল, গন্ধ আসিল, রূপ জাগিল এই পর্য্যন্ত কার চেতনা, কি শব্দ, কার শব্দ কোথা হইতে, কি ভাবে অনুভূত কিছু না; পরে অহংকার অভিব্যক্তি। diffused impersonal চেতনা পরিণত হইল আমার চেতনা; আমি এক, অনুভূতি বা প্রত্যয় অন্য; subject ও object বোধ। কাজেই অহংকারকে Subjectivation বলা যায়। তারপর generic শব্দ, generic রূপ, ইত্যাদি। উহাদের বিভিন্নতার বোধ তখনো নাই বা বাহির হইতে জড়াঘাতে বা স্পন্দনে যে এইসব অনুভূতি তাও মনে হয় না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তির সঙ্গে এই জড়ও বাহির বোধ হয়। প্রথম নিজ দেহের স্থানবিশেষের দ্বারা অনুভূতি জ্ঞান হয়। চোখ দিয়া দেখিতেছি, কান দিয়া শুনিতেছি, নাকদিয়া শুঁকিতেছি এই সব জ্ঞান হয়

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের localisation হয়। শব্দ হইলে শিশু কান ফিরায়, রূপ জাগিলে চোখ খোলে, হেয় রূপ হইলে চোখ বোজে; হেয় স্পর্শ হইলে অঙ্গ সংকুচিত করে। তারপর কর্ম্মেন্দ্রিয় বোধ। কথা কয়, হাত নাড়ে, পা নাড়ে ইত্যাদি। হেয় বস্তুর নিকট হইতে পলায়, প্রেয়বস্তু চায়, ইচ্ছা প্রকাশ করে ইত্যাদি : কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চালনায় হেয় বর্জ্জন ও প্রেয় অর্জ্জন করিতে শিখে। মন একাদশ ইন্দ্রিয় ইহা কতক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করে, কতক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে; মনের কাজ সংশয় করা, বিচার করা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা, বিজ্ঞানগুলিকে সংযোগ করতঃ বিষয় জ্ঞানে পরিণত করা ইত্যাদি।

সব শেষে জড় পঞ্চভূতের অনুভূতি; ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত। 'ভূত-বিশেষ' অপর সংজ্ঞা। অন্যান্য সংজ্ঞা যথা———বিকার, আকৃতি, বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর, মূঢ়। তন্মাত্রা যখন সবিশেষ ভাবে localised হয় তখন ভূতের জ্ঞান হয়। Objeetified sensationকে ভূত বলা যায়। বাহিরের জড়জগতের ধারণা পঞ্চভূতের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং এই সকল যখন আবার সুখ দুঃখ; আশক্তি বিরক্তি; হেয় প্রেয়; কাম্য, অকাম্য বিবিধ মনোভাবের States of consciousness সঙ্গে identified হয় তখনি জীবের পূর্ণ সংসার জ্ঞান হয়।

তারপর পুরুষতত্ত্ব——পুরুষ চেতনরূপী আত্মা; উহার লক্ষণ সূক্ষ্ম, বিভু, চেতনাযুক্ত; নির্গুণ, বিশুদ্ধ, অনাদি, অনন্ত, দ্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা অপ্রসবী। পুরাণাৎ এই হেতু পুরুষনাম। দেহী। পুরে কিনা দেহে ক্ষেত্রে শয়তে এই অর্থে পুরুষ। সংখ্যা শাস্ত্রে পুরুষ জীবস্থ অনুআত্মা বহু, (monads) পুরুষের সংজ্ঞা—আত্মা, পুমান, ক্ষেত্রজ্ঞ; নর, কবিব্রহ্মন, অক্ষর, প্রাণ, 'যঃকঃ' সৎ।

স্বরূপে পুরুষ কর্ত্তা নয়; কর্ত্তা হইলে শুধু ভাল কাজই করিত; গুণত্রয়ভেদে প্রকৃতিই কার্য্যশীলা; সত্ত্বপ্রভাবে ভাল, রাজপ্রভাবে মন্দ, তমপ্রভাবে মূঢ় কাজ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। পুরুষ এক নয় বহু, এই জন্য জীবভেদে পুরুষ নানাভাবে ভাবিত, নানা ভোগের ভোক্তা; কেহ দুঃখী কেহ সুখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূঢ়; যেমন গুণময় দেহের বা প্রকৃতির সহিত যুক্ত। পুরুষ বেদান্তমতে এক হইলে একজীব সুখী হইলে সকলে সুখী হইত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ পূর্ব্বে যে সব লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে 'এক' অখণ্ড, বিশুদ্ধ গুণাতীত বিভু বলিয়া মনে হয়; তবে আবার পুরুষ বহু এ বিরোধী উক্তি কেন? আমার মনে হয় দেহী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃতি সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত

হইয়া 'ভূতাত্মা' নামে অভিহিত, সেই পুরুষই বহু; কেন না ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত দেহের দেহী হওয়াতে তাহার প্রতীয়মান বহুত্ব ঘটিয়াছে। বিবেক জ্ঞানবলে মুক্ত হইলে তো সব পুরুষ সমধর্ম্মী হইয়া যান! বেদান্তের উপাধিযুক্ত জীবাত্মাই সাংখ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধ দেহী পুরুষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রবন্ধে যে মৈত্রায়ণী উপনিষদের উক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় দর্শনশাস্ত্রের আধুনিক রূপ লাভের বহু পূর্ব্বে সাংখ্য বেদান্ত মতদ্বয়ের মধ্যে মূল বক্তব্যে বড় বিরোধ ছিল না; ভাব একই ভাষা বা সংজ্ঞাই যেন আলাদা। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদে এইরূপ উভয় সাদৃশ্যের অনেক উক্তি আছে।

এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইল ইহাতে তত্ত্বসমাসকার বুঝাইলেন পুরুষ বা আত্মা ও প্রকৃতি স্ব স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ের সংযোগ ফলে এই প্রত্যয়াত্মক empirical জগৎ এবং প্রকৃতির স্বভাবজ গুণত্রয়ের তারতম্যে ও তদ্‌প্রভাবে এই সংসার। Thesis, antithesis ও Synthesis যাবতীয় moral ও physical qualities দিয়া (প্রকৃতি) জগৎকে হেয়+প্রেয় রূপ দিয়া সংসারে পরিণত করিয়াছে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত বিকৃতির অধোগতি হইল সাংখ্যেয় শংকর (Evolution) এবং পশ্চাৎগতি হইল প্রতি শংকর বা Involution। তত্ত্বজ্ঞানী ইহা জানিলে দুঃখের কবল হইতে মুক্ত হন।

তারপর অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবত বিচার। তত্ত্বসমাসকার দৃষ্টান্ত-যোগে ইহাদের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

বুদ্ধি অধ্যাত্ম (Subjective)
বস্তু বা বিষয় অধিভূত (objective)
ব্রহ্মা—অধিদৈবত (Dety)
চক্ষু—অধ্যাত্ম
দৃষ্টবস্তু—অধিভূত
সূর্য্য—অধিদৈবত
নাসা—অধ্যাত্ম
গন্ধদ্রব্য—অধিভূত
পৃথিবী—অধিদৈবত ইত্যাদি

এই কথা তিনটির আসল মানে বোধ হয় এই যে—জ্ঞানব্যাপারে জ্ঞাতা

ও জ্ঞেয় চাই ; no subject without object, no objeet without subject এবং অধিদৈবত হইল এই উভয়ের সংযোগ ঘটনকারী সূক্ষ্ম-কারণ-রূপী আর এক শক্তি। শুধু চেতনা ও শুধু বস্তু থাকিলেই জ্ঞান হয় না, বস্তুর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আর একটা শক্তি চাই যাহা এই সংযোগ ঘটাইবে। চোখ আছে, দ্রব্যও আছে, কিন্তু আলোকরশ্মি না থাকিলে দৃষ্টি জ্ঞান হইবে না। আত্মচৈতন্য ও অচেতন জড় উভয়ের মধ্যে যে মারাত্মক ভেদ তাহাতে একের উপর অপরের ক্রিয়া কেমন করিয়া হইবে? একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপরটা ঘোর জড় কাজেই তৃতীয় একটি শক্তি যাহা সূক্ষ্মকারণ রূপে অনুভূতি ব্যাপার ঘটাইতে পারে তাহার প্রয়োজন ; উহাই অধিদৈবত স্থানীয়। অবশ্য ঠিক বুঝান গেল না ব্যাপারটা কি। গীতায় অধিদৈবত বলা হইয়াছে জড়ের অভ্যন্তরস্থ কারণরূপী সূক্ষ্মপুরুষকে। জীবের চিত্তে যে জড় অনুভূতি হয় তাহা কি করিয়া ঘটে, উভয়ে যখন এত বিপরীত ধর্ম্মী? তাই বোধ হয় এই অধি-দৈবতের অবতারণা। জীবের অন্তরে অন্তর্যামী আত্মা আছেন, জড়ের অন্তরেও কুটস্থরূপে আত্মা আছেন ; উভয় আত্মাই একই পরমাত্মার অংশ বলিয়া উভয়ের স্বধর্ম্মত্ব ফলে এই অনুভূতি ব্যাপার ঘটে। like affects like।

অতঃপর অভিবুদ্ধি বিচার। অভিবুদ্ধি পাঁচ প্রকারের—যথা—ব্যবসায়, অভিমান, ইচ্ছা, কর্ত্তব্যতা, ক্রিয়া। ইহা করিতে হইবে—আমি করিব—এই কৃরিব—তদুদ্দেশে ইন্দ্রিয় নিয়োগ—কার্য্যসম্পাদন ইতি। হেয় প্রেয় কি ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া সংসারী জীব হেয়কে বর্জ্জন ও প্রেয়কে অর্জ্জন করিতে যে সব সঙ্কল্প ও চেষ্টা করে তাহারই বিবিধ stage হইল অভিবুদ্ধি।

অতঃপর কর্ম্মযোনি :—যে সব মানসিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় জীব সংসারে ভালমন্দ কর্ম্ম কার্য্য করিয়া বসে তাহাদের নাম কর্ম্মযোনি :—(ক) ধৃতি অপেক্ষা (খ) শ্রদ্ধা faith (গ) সুখ (ঘ) অবিবিদিষা carelessness (ঙ) বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা)। ইহাদের কতকগুলি প্রেরণা জাগায়, কতকগুলি উত্তেজনা জাগায় ; অবিবিদিষা ভুল কাজ করায়।

অতঃপর বায়ু-বিচার। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু। এই বায়ুতত্ত্বে সাংখ্যকার বলিতে চান জীব যে কর্ম্ম করে তার ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্দেশ্য, প্রেরণা আসে মন ও বুদ্ধি হইতে। এইটা কর্ম্মের psychological element ; তা ছাড়া উহার একটা physilogical element আছে তো।

কেবল ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকিলেই তো কাজ হয় না, কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা দরকার বটে। এই যে শারীরিক ক্রিয়া হয় ইহা কতকগুলা vital function বটে এবং vital nervous energy প্রাণশক্তি এই সব কাজ সম্পাদনার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালায়। বায়ু এই vital energy এক একটি বায়ুর এক একটা sphere of action ক্রিয়াস্থান আছে। প্রাণবায়ু মুখ নাককে চালায়। অপান নাভি দেশকে ক্রিয়াশীল করে। সমান অন্তঃকরণকে চালায়। উদানবায়ু কণ্ঠনালীর চালক। ব্যান সর্ব্বদেহের চালক। আচার্য্য মোক্ষমূলর বলেন এই বায়ু কথাটার ঠিক যে কি অর্থ তা স্থির হয় নাই। তিনি বায়ুকে wind বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ ঠিক কথাটী vital spirit নিজেই আন্দাজ করিয়া এবং ঠিক অর্থ বুঝিয়াও তবু ইহার সত্যতার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি বায়ুতত্ত্বের original অর্থ খুঁজিয়া পান নাই আক্ষেপ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁর যে পূর্ব্বাপর সংস্কার যে আদিম সাংখ্যমত cosmic creation এর ব্যাখ্যা করিয়াছে; psychological সংসার সৃষ্টিই যে কপিলের প্রধান প্রতিপাদ্য ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ। এ অর্থ তাঁর মতে অর্ব্বাচীন সাংখ্যবাদীদের স্বকপোলকল্পিত। এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্যে তিনি অধিকাংশ তত্ত্বের ব্যাখ্যার গোলে পড়িয়াছেন। যেখানে cosmic creation মতকে গোঁজা দিয়া মিলাইতে পারিয়াছেন সেখানে তাহা করিয়াছেন; যেখানে পারেন নাই সেখানে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ম্মাত্মা-তত্ত্ব বিচার:—কর্ম্মাত্মা কি না ego as active; কর্ম্মকারী-আত্মা। ইহারা পঞ্চবিধ; যথা—(ক) বৈকারিক (খ) তৈজস (গ) ভূতাদি (ঘ) সানুমান (ঙ) নিরনুমান—অস্যার্থ:—বৈকারিক কর্ম্মাত্মা শুভকার্য্যের কারক; তৈজস কর্ম্মাত্মা মন্দকার্য্যকারী; ভূতাদি তামসকার্য্যকারী (hidden acts)। সানুমান কর্ম্মাত্মা সজ্ঞানে শুভকারী; নিরনুমান কর্ম্মাত্মা, অজ্ঞানে মন্দকারী। অর্থাৎ অভিমানী দেহী: জীবাত্মারা: পাঁচ প্রকার দেখা যায়। একশ্রেণী ভালই কাজ করে, একশ্রেণী নিষ্ঠুর পীড়াদায়ক কাজ করে; একশ্রেণী জঘন্য মন্দকাজ করে; একশ্রেণী না জানিয়া মন্দ করে, একশ্রেণী জানিয়া ভাল করে। দৃষ্টান্ত—দাতা দীনপালকরা বৈকারিক কর্ম্মাত্মা দেশজয়ী বীররা তৈজস কর্ম্মাত্মা; চোর ডাকাত নরঘাতকরা ভূতাদি কর্ম্মাত্মা।

অতঃপর অবিদ্যা বিচার:—অবিদ্যা বা অজ্ঞান যথা—(ক) তমস (খ) মোহ (গ) মহামোহ (ঘ) তমিস্রা (ঙ) অন্ধতমিস্রা। তম ও

মোহ প্রত্যেকে অষ্টবিধ। মায়ামোহ দশ প্রকার। তমিস্রা ও অতমিস্রা প্রতেকে অষ্টাদশ প্রকার। তমোর ফল দেহাত্মবোধ। যোগলব্ধ বিভূতির গর্ব্বফলে মোহ অবিদ্যা। মহামোহ মুক্তি সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান তমিস্রা অষ্ট-সিদ্ধির প্রতি প্রকাশ্য হিংসার ফল। অষ্টসিদ্ধি লাভের পর মরণকালীন যে দুঃসহ দুঃখাবস্থা তাহাই অন্ধতমিস্রা।

অতঃপর অসক্তি দুর্ব্বলতা তত্ত্ব বিচার ঃ—

অসক্তি ২৮ প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ১১ দোষ ও বুদ্ধির ১৭ দোষ। অন্ধতা, মূকতা, বধিরতা ইত্যাদি খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুষ্ঠ, স্বরবদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি বিশটী ইন্দ্রিয়দোষ, মনের উন্মত্ততা, এবং বুদ্ধির ১৭ সংখ্যক অতুষ্টি ও অসিদ্ধি এই সব জীবের দুর্ব্বলতা।

অতঃপর অতুষ্টি ও তুষ্টিতত্ত্ব।

তুষ্টি contentment বা মনের pacific অবস্থা। উহা সংখ্যায় নয়টী। অতুষ্টি তদ্বিপরীত, এবং সংখ্যায় নয়টী। যথা ঃ—(১) অনম্ভা=প্রধানের অনস্তিত্ব বোধ (২) তামসলীনা=আত্মামহতের একাত্মতা বোধ (৩) অবিদ্যা=অহংকারের অস্বীকার (৪) অবৃষ্টি=তন্মাত্রার অস্বীকার (৫) অসুতার=ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণ (৬) অসুপার=ভোগসুখে আসক্তিস্থিতি (৭) অসুনেত্র=ধনাকাঙ্ক্ষা (৮) অসুমরিচীকা=যোগাসক্তি (৯) অসুত্ত-মস্তসিকা=পরের অনিষ্ট হইবে অগ্রাহ্য করিয়া ভোগসুখ।

অতঃপর অসিদ্ধিতত্ত্ব। সিদ্ধি অর্থাৎ perfection অতার—সুতার—অতরাতার—অপ্রমোদ—অপ্রমুদিত—অপ্রমোদন—অরম্য—অসৎপ্রমুদিতম। এই হইল অষ্ট প্রকার অসিদ্ধি। যথাক্রমে—অর্থ—একে বহুবোধ—তত্ত্বকথার ভুলবোধ—বুদ্ধিহীনতা দোষে তত্ত্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা—তত্ত্বজ্ঞানে বিরক্তি—সম্বন্ধুর সুযুক্তিশ্রবণপরাঙ্মুখতা শিক্ষকদোষে জ্ঞানলাভে অসমর্থতা—ইত্যাদি।

মুলিকার্থ তত্ত্ব ঃ—সাংখ্যশাস্ত্রের মূল অষ্ট প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। যথা প্রকৃতির অস্তিত্ব, একত্ব অর্থত্ব, পরার্থ্যত্ব; পুরুষপক্ষে—প্রকৃতি হইতে অন্তত্ব, অকর্তৃত্ব, বহুত্ব। প্রকৃতিপুরুষের ক্ষণিক সংযোগত্ব, এবং পরে স্বতন্ত্রত্ব। সূক্ষ্মশরীরে স্থিতি, স্থূলশরীরেরও স্থিতি (durability)

অনুগ্রহসর্গ=অর্থাৎ পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক অনুগ্রহবশাৎ তন্মাত্রা হইতে জগৎ সৃষ্টি।

অতঃপর ভূতসর্গ=অর্থাৎ জীবজন্তুদের সৃষ্টি। দেবসৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, ইতরজীব সৃষ্টি ইত্যাদি।

অতঃপর বন্ধ বা ভোগতত্ত্ব। বন্ধ ত্রিবিধ—(১) অষ্ট প্রকৃতির বন্ধন (২) ষোড়শ বিকারের বন্ধন (৩) দক্ষিণাবন্ধন। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদি যজন যাজনের জন্য যে দক্ষিণা দিতে লোকে ধর্ম্মভয়ে বাধ্য হইত তাহাকেই কপিল দক্ষিণা বন্ধন বলেন। আসলে উহা মিথ্যাধর্ম্মের বন্ধন।

অতঃপর মোক্ষতত্ত্ব।—ত্রিবিধ মোক্ষ—(১) জ্ঞানাৎমোক্ষ (২) ইন্দ্রিয়-জয়াৎ (৩) সর্ব্বধ্বংসাৎ অর্থাৎ সংসারত্যাগাৎ বৈরাগ্যাৎ বা।

অতঃপর দুঃখতত্ত্ব—যে দুঃখের অবসানেই মোক্ষ। ইহাও ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ কায়মানসিক—আধিভৌতিক—হিংস্রজীব জন্তু চোর ডাকাৎ ইত্যাদি হইতে, আধিদৈবিক শীতাতপ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, প্লাবন ইত্যাদি।

এইখানে তত্ত্বসমাসের পরিসমাপ্তি। উহার তত্ত্বগুলির বিচারকালে যে সব বাক্য প্রতিবাক্য সংজ্ঞা ব্যবহার হইয়াছে তাহাতেই আরো বুঝা যায় যে এই গ্রন্থোক্ত সাংখ্য শাস্ত্র আসলে সংসার সৃষ্টি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। আর ইহাই সম্ভব—কেননা ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিতে বসিয়া দুঃখের মূল সংসার সৃষ্টি ব্যাখ্যাই ন্যায্য বিষয় হইবে; কি করিয়া nebu- lous homogenous জড় হইতে force যোগে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত, আকাশ বাতাস, জীবজন্তু বন জঙ্গল হইল ইহা ভবরোগের চিকিৎসকের কাছে ধানভানতে শিবের গীতের মতই হইবে। 'সংসার-সৃষ্টি' আর cosmic-জগৎ সৃষ্টি যে মহর্ষি কপিল মতে ভিন্ন তত্ত্ব এবং প্রত্যেকের স্রষ্টা। যে ভিন্ন—তাহা—তত্ত্ব সমাসের ভাষ্যকার স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। সংসার সৃষ্টি—অবিবেকীপুরুষ ও ক্রিয়াশীল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সংযোগে ঘটে—আর বিশ্বসৃষ্টি তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। অনুগ্রহসর্গ তত্ত্ব বিচারে দেখা যায় ব্রহ্মা পুরুষের ভোগের জন্য পঞ্চতন্মাত্রা হইতে ইন্দ্রিয়দের অনুভূতির জন্য জড়জগৎ সৃষ্টি করিলেন; ভূতসর্গ বিচারে দেখা যায় ব্রহ্মা সেই উদ্দেশ্যে চতুর্দ্দশভুবনের দেব মনুষ্য জীবজন্তু তরুলতাদি সৃষ্টি করিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, প্রকৃতি যোগে জড় বা জঙ্গম জগৎ সৃষ্টির কোনা কথা নাই; এজন্য ব্রহ্মার কর্তৃত্ব অনুমিতবা স্বীকৃত হইল। প্রকৃতি পুরুষ কেবল মাত্র সংসার সৃষ্টির জন্য দায়ী, যে সংসারজীবের সকল দুঃখের মূল। ইহা বিশুদ্ধ psychological creation মানস সৃষ্টি পূজ্যপদ শ্রীধর স্বামীগীতার১৩ দশঅধ্যায়তাহাই বলিয়াছেন। ২৬।২৭শ্লোকেরটীকাদ্রষ্টব্য।

এক্ষণে কি উপায়ে দুঃখ নাশ করা যায় তাহা নির্ণয় করিতে গেলে, দুঃখের যে হেতু তাহার বিচার চাই ; অর্থাৎ সংসারই দুঃখের মূল। এই সংসার কি ; কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে ? কি করিয়া জীবকে বন্ধন করে ? এ সবের বিচার কর্ত্তব্য ; সংসারকে নাশ করিতে গেলে, যাহার ক্রিয়া ফলে সংসার, তাহার নাশ দরকার, কার্য্যকে উড়াইতে গেলে কারণকে উড়াইতে হইবে সংসার কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার ধ্বংস চাই ; কেমন করিয়া অবিদ্যার নাশ হইতে পারে ? উহার বিপরীত শক্তি জ্ঞান, বিবেক জ্ঞান তাহারি সাহায্যে অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে হইবে ; যেমন অন্ধকার নাশ করিতে গেলে আলোর দরকার। গীতাকার ১৩ দশ অধ্যায় ২৬।২৭ শ্লোক তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিন্দু দর্শন শাস্ত্র যদি পাশ্চাত্য দর্শনের সমজাতীয় শাস্ত্র হইত, অর্থাৎ কেবলমাত্রই পরম তত্ত্বের আলোচনা হইত তাহা হইলে দুঃখনাশ করিবার হাঙ্গামা লইয়া এত মাথা বকাইত না ; কি দুঃখ, কেন দুঃখ, কিরূপে ইহার নিবৃত্তি হইবে, হইলে কি অবস্থা হয় এসব তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারেনা। কিন্তু হিন্দু দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র গৌনভাবে তর্কশাস্ত্র। জীবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়জগৎটা জড়াইয়া আছে বলিয়াই মোক্ষ-শাস্ত্রকার জড়জগতের স্থিতি উৎপত্তি লয় লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন ; জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতির সঙ্গে উহার কোনো সম্বন্ধ না থাকিলে মোক্ষশাস্ত্রকাররা উহাকে আমলেই আনিতেন না, উহা অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিত। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রধান সমস্যার মধ্যে জীবের প্রতিমুক্তি ভাগ্যাভাগ্য একটা সমস্যাই নয় ; উহা অবান্তর ভাবে আলোচিত। কিন্তু হিন্দু দর্শনের উহাই প্রধান প্রতিপাদ্য প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাজেই মনে হয় সাংখ্য বা বেদান্তে Spencer Darwin এর Evolution তত্ত্ব খুঁজিতে যাওয়ায় সব স্থানে নিরাপদ নহে।

সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পাশ্চাত্যদর্শন ও হিন্দুমোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে parallelism খুঁজিতে গিয়া এখনো তর্কযুদ্ধ কত যে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 'মায়া' 'অবিদ্যা', 'অজ্ঞান' অবিবেক কথা গুলাই যে মহাপ্রবল সাক্ষী যে ভারতীয় আর্য্য দর্শনশাস্ত্র মূলতঃ মুক্তিশাস্ত্র। তা না হইলে বিশ্বসৃষ্টি cosmic creation বুঝাইতে গিয়া 'মায়া' 'অবিদ্যা' ইত্যাদিকে ব্রহ্মের সৃজনাশক্তি বলা কেন ? সোজা সরল বৈজ্ঞানিক কথা ব্যবহার করিলেই হইত না কি ?

attraction, repulsion ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে সাংখ্য বেদান্ত spencer প্রভৃতির মত cosmic সৃষ্টির (ভৌতিক সৃষ্টির) শাস্ত্র নহে—সাংখ্য বেদান্ত সংসারসৃষ্টি লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন।—এই যে আসলে নির্গুণ জগৎটার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যগুলা আমার কল্পনার ধারা ভাল মন্দ, ছোট বড়, সুন্দর অসুন্দর, হেয়-প্রেয় রং মাখিয়া সংসার সাজিয়া আমাকে ভুলাইতেছে সুখ দিতেছে, দুঃখে মজাইতেছে ইহাই আমার সব কষ্টের মূল; আমার আসল স্বভাবে নির্ব্বিকার আত্মাটা এই রঙীন আবরণ হইতে রং মাখিয়া দেহের সঙ্গে নিজেকে ভুল করিয়া অনর্থ ঘটাইতেছে—মোক্ষশাস্ত্র কৃপায় আমি বুঝিতে পারি আত্মা দেহ নয়, উহার কোনো বিকার হয়না, উহা নিঃসঙ্গ সুখ ভোগে নয়, সুখ আত্মবোধে; জগৎটা ব্রহ্মভাবেই সত্য, সংসারভাবে মিথ্যা, আর আমি জগতেরই একটী অংশ, জগৎই ব্রহ্ম; যেমন পাতা ফুল, মূল, কাণ্ড, লইয়া 'গাছ', তেমনি এই "নদ নদী-পাহাড় বন, মানুষ কীট পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস জল-স্থল, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, হর্ষ-বিষাদ", ইত্যাদির সমষ্টিকেই বলি ব্রহ্ম; একে বহু, বহুতে এক। এই দৃশ্যমান বিচিত্র সত্তা ছাড়া আর একজন হাত পা চোখ নাকওয়ালা ভগবান কোথাও নাই। যা সৎ তাই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। হইতে পারে তাঁর নির্ব্বিশেষ অবস্থা ছিল; কিন্তু সবিশেষেই তাঁহাকে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, উপাসনা করিতেছি। অজ্ঞানে বা মোহে, জগৎকে ঈশ্বর হইতে অন্য দেখি, আর জগতের পরিবর্ত্তনশীল, পদার্থগুলিকে, পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া নিত্য ও অনশ্বর ভাবে আছে বলিয়া মনে করি। নিত্যকে অনিত্য অনস্তি ভাবি, আর অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভুল করি। এই যে জগতে সংসার জ্ঞান, ইহা মিথ্যা নয়তো কি? মায়া নয়তো কি? কল্পনার খেলা নয়তো কি? শংকর সংসার সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা বা মায়া বলাতে কিছুইতো অন্যায় করেন নাই, বরং অত্যন্ত খাঁটী কথাই বলিয়াছেন। তিনি যদি কোথাও বলিতেন অবিদ্যা বলে ইট কাঠ মাটী পাথর, জল স্থল পর্ব্বত এই সব তৈয়ারি হইতেছে আর ভগবান মোহ বলে, অবিদ্যায় মজিয়া, আকাশ বাতাস, জলস্থল নদ নদী পাহাড় জীবজন্তু করিতেছেন তাহা হইলে মানিতাম এ আবার কি। একি বুঝা যায়? আমি একটী ছবি আঁকিলাম; ওয়াট সাহেব ইনজিন করিলেন; লেসলি সাহেব সাঁকো গড়িলেন এসব কি অবিদ্যায় মজিয়া গড়িলেন? তার কি অর্থ হয়? কিন্তু যদি বলি রামবাবু সুখী হইবে বলিয়া মদ ধরিল, বা মোটর কিনিল, বা বিবাদী প্রতিবেশীকে খুন করিল, এবং

অবিদ্যা বলে এসব করিল, তখন মানিব তাহা সত্য। এখানেই অবিদ্যার কাজ; সাঁকো গড়া বা ছবি আঁকা বা এনজিন্ করা অবিদ্যার কাজ নয়। তেমনি ব্রহ্ম শক্তি বলে বিচিত্র বিশ্ব গড়িলেন; এ শক্তি মায়া নয়, অবিদ্যা নয়, অজ্ঞান নয়। মায়া রূপকভাবে বলিতে পার। মায়া জীবের বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু যখন জীব জগতকে নিজ উপযোগী হেয়প্রেয় ভাবাত্মক সংসারে পরিণত করে; তখনই বলিতে পারি আমার pure Ego শুদ্ধ বুদ্ধনির্ব্বিকার ব্রহ্ম অংশ বাহ্য জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া Empirical Ego বা self বা মায়া সংসার রচনা করিল। এই Empirical self কেই চরম সত্য মনে করাতেই জীবের যত দুঃখ ভজন।

শংকরাচার্য্য যেখানে জগৎকে অবিদ্যার বা মায়ার সৃষ্টি বলিয়াছেন সেখানে জগৎ মানেই সংসার বুঝিতে হইবে। কেন না জীবের বিশেষতঃ বদ্ধ জীবের চোখে জগৎ সংসার ভাবেই বিরাজ করে। জগতের সঙ্গে জন্মমাত্র হইতেই, হেয় প্রেয় সম্বন্ধ। জন্ম হইতেই জীব দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মাকে দেহের সঙ্গে এক মনে করে। এই জন্যই জগৎ তার চক্ষে সংসার সঙ্গে একার্থবোধক হইয়াছে। শংকর যখন বলিলেন জগৎ অবিদ্যাপ্রসূত; তখন তিনি বলিতে চান সংসার অবিদ্যাপ্রসূত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁৎ ধরিলেন জগৎ (cosmos) কি করিয়া অবিদ্যাপ্রসূত হইতে পারে? কেন না অবিদ্যা কার? ব্রহ্মের; কিন্তু ব্রহ্ম স্বভাবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিত্য, তিনি কেন ignorance বা illusionএর দাস হইবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি—

তাই বলিতেছি সাংখ্য বা বেদান্তকে—মুখ্যতঃ মোক্ষশাস্ত্র ভাবে বুঝিলে এই সব গোলমাল কাটিয়া যায়। শংকরের রচিত চর্পটচারিকা স্তোত্র (দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ etc) পাঠ করিলে দেখা যায় আচার্য্য এই সংসার সকল ভবব্যাধির মূল তাহাই অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারঃ। জ্ঞাতে তত্ত্বে—কঃ সংসারঃ॥ ১০॥ এই অর্দ্ধ শ্লোকেই শংকরের সমস্ত **মায়াতত্ত্ব সংসারতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব** প্রকাশ হইয়াছে।

অতএব শংকরাচার্য্যের দর্শন শাস্ত্রে আলোচিত জগৎতত্ত্ব ও মায়াবাদ বুঝিতে কোনই গোল হয় না যদি জগৎকে সংসার ধরা যায়। এবং উহাই সত্য অর্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেমের জয়

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক]

আজি পাপের করিতে শেষ
ই ছুটিয়াছে কোটী প্রেমের মূরতি শচীনন্দন রে।
কিবা বীর সন্ন্যাসী বেশ!
সবে মেতে যায় গাহি সত্য মুক্তি জয় বন্দন রে!
ওই নিমাই এসেছে আজ
এল কোটী শচীমাতা ঘর দ্বার ছাড়ি ধীর সহিষ্ণু হিয়া,
সাথে পরিয়া শক্তি সাজ
এল বীর জায়া কোটী পুণ্য প্রতিমা দেবতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
ওই পথে পথে দ্বারে দ্বারে
চলে মাতা বধূ সুত বীরের বাহিনী—আননে দৃপ্ত হাসি;
কহে হুঙ্কারি বারে বারে
জয় সত্যম্ জয় মুক্তিঃ জয় মুক্ত-ভারতরাণী'!
সবে লাঞ্ছনা ভীতি হারা—
চলে, অঙ্গে অঙ্গে স্ফুরিয়া উঠিছে করুণা স্নিগ্ধ বিভা!
চলে জীবন্মুক্ত পারা,
আহা বক্ষে বক্ষে প্রেমের পাথার উথলিয়া পড়ে কিবা!
আজি দেখ্ রে অবিশ্বাসি,
ওরা কত শত পাপী জগাই মাধাই করে গেল উদ্ধার,
শুধু বিলায়ে ক্ষমার রাশি
ওরা যেচে দিল প্রেম কত মার খেয়ে, নাহি নিল শোধ তার।
আজি অনাহত চির জয়ে
ওরা চলিয়াছে দেশ মথিয়া মথিয়া গাহিয়া বিজয় গান,
আজি ঘোষিতে সত্যময়ে
সবে মুক্তি পতাকা উড়ায়ে ছুটেছে, দেখে কাঁপে শয়তান!

আজি স্বাধীন করিতে দেশ
সবে চলে যায় দলি চরণে মরণ ভয় বন্ধন রে!
আজি পাপের করিতে শেষ
ওই ছুটিয়াছে কোটী প্রেমের মূরতি শচীনন্দন রে!

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩৭)

দশটা বাজিয়া গেল, তবু ব্রজেন্দ্র ফিরিল না। পূজারী ঠাকুর অন্যান্যদিন ইহার পূর্ব্বে ঠাকুরের পূজা সারিয়া চলিয়া যায়, সেও ত আসিল না। স্বামীর খবর লইতে নির্ম্মলা হেমাকে চারুর বাড়ী পাঠাইয়াছিল, এক ঘণ্টার উপর হইল, সেওত এখনও ফিরিয়া আসিল না!

নির্ম্মলা এইবারে বিশেষরূপ চিন্তিতা হইল। সত্য সত্যই তবে কি সর্ব্বনাশী অনুতাপের জ্বালা সহিতে পারিল না, গঙ্গাজলে প্রাণটা বিসর্জন দিল?

পূর্ব্বে যথার্থই নির্ম্মলার মনে চারুর মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, মনের আবেগে হয়ত মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গিয়া থাকিবে। আবেগটা শান্ত হইলেই আবার সে ফিরিয়া আসিবে। এখন যেন তার মন বলিতেছে সে আর আসিবে না।

কিন্তু ভট্টাচাজ্জি মশাই এখনও আসিল না কেন? তাহার না আসিবার একমাত্র কারণ হইতে পারে, পূর্ণপ্রকোপ না থাকিলেও, অবসানমুখে ঝড়ের এলোমেলো ভাব ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। কিন্তু এ কারণে নির্ম্মলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। স্বামী ফিরিয়া আসিবার অথবা হেমা সেখান হইতে কোনও সংবাদ আনিবার পূর্ব্বে যদি রাখু ঠাকুরের পূজা ও ভোগ সারিয়া যাইত, তা হ'লে সে যেন নিশ্চিন্তা হইতে পারিত। ইহার পর, পূজার সময়ে যদি তাহার স্বামী অথবা হেমা হঠাৎ সে মেয়েটার মরার খবর লইয়া আসে? মেয়েটা নষ্ট হইলে কি হইবে—সে ভট্চাজ্জি মশায়ের শ্রীত বটে! সে মরিলে তাঁরত অশৌচ হইবে! সেরূপ অবস্থায় সে রাখুকে কেমন করিয়া ঠাকুর ছুইতে দিবে?

এগারোটা বাজিতেও যখন কেহ কোনওদিক হইতে আসিল না তখন পূজার জন্ত রাখুর অপেক্ষা করা নির্ম্মলার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তেতলায় ছিল ঠাকুর ঘর সেইখানে বসিয়া নির্ম্মলা রাখুর অপেক্ষা করিতেছিল। সে ছাদে আসিয়া আলিসা হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকিল—"সরি''।

"তাকে আমি বাজারে পাঠিয়েছি বৌমা।"

নির্ম্মলা শুধু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার শাশুড়ী বলিতে লাগিল—"হেমা বাড়ীতে নাই, হিন্দুস্থানী চাকরটাও আসেনি—তুমি পূজারী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ক'রেছ মনে নেই ?"

"যথার্থই সে কথা আমার মনে ছিলনা ত মা! পাঠিয়ে ভালই করেছ।"

"কিন্তু পুজাত এখনও ঠাকুরের হল না।"

"সেই জন্যই ত সরিকে ডাকছিলুম। ভট্চাজ্জি মশায় কেন আস্‌ছেন না জান্‌তে তাকে পাঠাব।"

"ব্রজেন্দ্র কি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে ?"

চমকিতার মত নির্ম্মলা প্রতি প্রশ্ন করিল—"এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে মা ?"

"সরি বল্‌ছিল।"

"আমি যা শুন্‌লুম না, তা সরি কেমন ক'রে শুন্‌লে ? সে কি বল্‌ছিল ?"

"বলছিল, বাবু আর ও বামুনকে ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না। তার স্বভাব নাকি ভাল নয়!"

"কই মা, আমিত এ কথা তোমার ছেলের মুখে শুনিনি!"

"স্বভাব যদি ভাল না হয়, তাহ'লে তাকে পুজো করতে দেওয়া ত উচিত নয়।"

"নিশ্চয়। তোমার ছেলে এলে এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করব।"

"ব্রজেন্দ্রই বা আজ এমন দিনে কোথায় বেরুলো বউমা ?"

"একটা বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমিই তাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছি।"

"পাঠাবার কি আর দিন পেলেনা মা ?"

"তাঁর ফিরতে যে এতটা দেরি হবে সেটা তখন বুঝতে পারিনি। তাঁকে ডেকে আনতে হেমা হতভাগাটাকে পাঠালুম, সেও এখনও ফিরছেনা কেন বলতে পারি না।"

"বামুন যদি না আসে তাহ'লে পূজোর কি হবে?"

"বামুনের আসা না আসার কথা তোমার ছেলেই যদি জানে, সেই এসে পূজো করবে!"

শাশুড়ী বুঝিল বউএর একটু রাগ হইয়াছে। সে বলিল—"ছেলের উপর রাগ করবার কথা কিছুইত নেই মা।"

নির্ম্মলা উত্তর করিল না।

শাশুড়ী তখন কথাগুলা যতটা পারিবার' মিষ্ট করিয়া বলিল—"রাগ করনা বউমা, ছেলে আমার মূর্খ নয়। তোমার ননদের পানে আর চাওয়া যায় না—বুঝেছ?"

"শুধু ননদ কেন মা, স্বভাব খারাপ হ'লে, আমরাইবা কেমন করে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কব!"

"কলতলায় একখানা কাপড় দেখলুম, সেখানা কার? সরি বললে ভট্‌চাজ্জি মশার।"

"সরি ঠিক বলেছে, সেখানা তারই কাপড়।"

"সেখানায় কি রঙ লেগে রয়েছে দেখলুম।"

"বোধ হচ্ছে আলতা।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেইত তাঁকে সে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

"তাতে একখানি আগু পায়ের দাগ।"

এ কথায় নির্ম্মলা হাসিয়া ফেলিল।

"মিছে কথা কইনি বউ মা—বিশ্বাস না হয় তুমি দেখে এসো।"

"মিছে কথা কেন হবে মা—আমিও তা দেখেছি।"

"তবে?"

ঠিক এই সময়ে শুভা উপরে আসিয়া বলিল—"সব রঙ উঠিয়ে দিয়েছি বৌদি।" বলিয়াই সে নির্ম্মলাকে রাখুর কাপড় দেখাইল।

"ভাইত রে, ধোপানীকে হারিয়ে দিয়েছিস যে! যা ভাই বারান্দার ভিতরে কাপড়খানা শুকুতে দে। ভট্‌চাজ্জি মশাইয়ের যাবার আগে যেন শুখিয়ে যায়।"

শুভা চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে ছিল, তার মা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াছিল চাহিতে চাহিতে তার মুখখানা রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তার মুখখানা দেখিল। তাহাকে লুকাইয়া একটু হাসিল।

কন্যা চলিয়া গেলে, যখন তার মা নির্ম্মলার দিকে ফিরিল, তখনও তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"কি মা, তোমার মেয়েকে দিয়ে ওই কাপড় কাচিয়েছি বলে কি তোমার রাগ হ'ল?"

"আমার রাগে কার কি এসে যায় মা। আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি।"

"এইটেই যে রাগের কথা হল মা—আমি জানতুম, আমরা তোমার ছেলে, মেয়ে নাতী নাতনী সব তোমারই আশ্রয়ে আছি।"

এমন মনুষ্যত্ব-হীনতা শুভার মায়ের ছিল না যে, এরূপ কথাতেও তার মুখ প্রফুল্ল না হয়। শুধু তার মুখ প্রফুল্ল হইল না, তার চোখের কোণে জল আসিল। বলিল "আমিও মা ব্রজেন্দ্রকে যে পেটে ধরিনি, এ একদিনের জন্যও মনে করতে পারিনি, মিছে কইব কেন, রাগ আমার হয়েছিল। বোকামেয়ে আইবুড়ো ননদকে দিয়ে—"

"আমি নিজেই কাদছিলুম মা, অভাগী পায়ে এমন রঙ লাগিয়েছে কোনও মতে তুলতে পারছিলুম না দেখে, তোমার মেয়ে উপর-পড়া হয়ে কেড়ে নিলে।"

"আবাগী কে?"

"গরীব ব্রাহ্মণের উপর তার অত্যাচারের যেটুকু বাকী ছিল, আবাগী তার কাপড়ের উপর দেখিয়েছে।"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা বউমা, আবাগীকে?"

'আবাগীর পরিচয় দিবার একটা স্নবিধা নির্ম্মলার ঘটিয়াছিল, কিন্তু বলিবার মুখে তার এমন একটা সঙ্কোচ আসিল যে কিছুতেই কথা তার মুখ হইতে বাহির হইল না। এদিকে তার শাশুড়ী সাগ্রহদৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখের পানে চাহিয়া কি করে, নির্ম্মলাকে বলিতে হইল, সে চরণচিহ্নটির অধিকারীর কথা—

"মা! সেটি তোমার ছেলের সো-রাণীর।"

অতি বিস্ময়ে নির্ম্মলার চোখের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া 'মা' বলিয়া উঠিল—

"বলিস্ কি গো! ব্রজেন্দ্র কি তবে বামুনকেই খুন করতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল?"

এ কথার উত্তর নির্ম্মলা দিতে না দিতে নীচে হইতে এক কণ্ঠস্বরে উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। "ঠাকুর মা কোথায় গো!"

কথা শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিল স্বামী নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর ঈর্ষায় একটা অকার্য্য করিয়া বসিয়াছে। তার মুখ দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া গেল। শুভার মা বুঝিল, সে চরিত্রহীন বামুনটাকে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্র আর ঠাকুর ছুঁইতে দিল না।

কুতুহলীর মুখ লইয়া সে উপরে আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৩৪)

উভয়েই বুঝিল কে আজ পূজা করিতে আসিতেছে।

তাহার নাম মধুসূদন। যজমানেরা বলিত মধুঠাকুর। রাখুর পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে সে পুজারির কার্য্য করিত। পুজার পদ্ধতি ভাল জানিত না, আর মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া ব্রজেন্দ্র রাখুকে তাহার স্থানে ঠাকুর পুজার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। উভয়েই বুঝিল সেই মধুই পুজারির কাজে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর মধুর সিঁড়িতে উঠার শব্দ যেই নির্ম্মলার কাণে গেল, অমনি সে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া খাশুড়ীকে বলিল— "মা! আর বিলম্ব না ক'রে তুমি ঠাকুরের ভোগ নিয়ে এসো।"

প্রকৃতিস্থ বলিলাম কেন, এই ক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যে এতগুলা চিন্তা একসঙ্গে তার মনকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, সেই ক্ষুদ্র পলটুকুর মধ্যে সে আপনাকে এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

"যাও মা, আর দাঁড়িয়ো না।"

"তাইত ব্যাপার টাকি বউ মা?"

"আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই মা, বুঝতে পারছি ঠাকুরের অদৃষ্টে আজ উপবাস আছে, তবু তার সমুখে অন্ন পাত্র ত একবার ধরতে হবে।"

বলিয়া নির্ম্মলা ঠাকুর ঘরে চলিল।

যেতলায় আসিবার দ্বারে পৌঁছিয়াই, শুভার মাকে দূর হইতে যেমন দেখা, মধু বলিয়া উঠিল—"কিগো ঠাকুর মা কেমন আছেন?"

হারানো চাকরির পুনঃ প্রাপ্তির উল্লাস—ঠাকুরমার কাছে আসিয়া কথা কহিতে মধুর দেরি সহিল না। তার উল্লাসের উচ্চারিত কথা নির্ম্মলা অতি দূর হইতেও শুনিতে পাইল। শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল মাত্র, নিজে আর ফিরিল না।

শুভার মা সেটা দেখিল। তার কৌতুহল রঞ্জিত দৃষ্টি সেই সঙ্গে সপত্নী পুত্র-

বধূর মুখে এমন একটা বিবর্ণতা দেখিতে পাইল যে, নির্ম্মলার অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শুভার মা চোখকে আর মধুর দিকে ফিরাইতে পারিল না।

"কি ঠাকুর মা, কথা শুনতে পেলেন না?"

"কেও, মধু।"

"সেই মুখ্‌খু মধু। কেমন আছেন?"

শুভার মা উত্তর দিলেন না। সে মধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখে আশ্চর্য্য হবারই কথা ঠাকুর মা।"

"তুমি যে আজ পূজো করতে এলে?"

"আবার আসতে হ'ল। নারায়ণ ত আর মন্তর খান না, বুজরুকিও খান না—খান শুধু ভক্তি। তাই আবার মুখ্‌খু মধুকে টান দিলেন।"

"ও ঠাকুর কি আর আসবে না?"

"আবার! কর্ত্তা মশাই তাকে, গলায় হাত দিয়ে, বাসা থেকে বার ক'রে দিয়েছেন।"

তাহারা অনেক পূজারি এক পূজারির আশ্রয়ে কার্য্য করিত। ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি বহু গৃহস্থ তাহারই যজমান। একা বহুলোকের গৃহে পূজা করা অসম্ভব বলিয়া যারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবককে সে পূজার জন্য নিযুক্ত রাখিত। রাখু তাহাদেরই মধ্যে একজন। বৃদ্ধকে তাহারা কর্ত্তা মশাই বলিত। তাহারা কর্ত্তামশায়েরই সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকিত। সে যেখানে পূজার সামগ্রী চাল কলা দুগ্ধ মিষ্টান্ন পাইত, সমস্তই কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইত। সেই সব আতপ তণ্ডুল হইতেই তাহাদের মধ্যাহ্নের আহার চলিত।

'কর্ত্তা মশায়'কে শুভার মা'র বুঝিতে বাকি ছিল না। এটাও বুঝিতে তার বাকি রহিল না, ব্রজেন্দ্রের রক্ষিতার ঘরে ওই মুখচোরা ভিজে বিড়ালের মত বামুনটা ঝড়ের সমস্ত রাত যাপন করিয়াছে।

তথাপি, যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বিস্মিতার মত শুভার মা প্রশ্ন করিল "কেন মধু?"

"আপনার আর সে কথা শুনে কাজ নেই ঠাকুর মা! সে অতি কুৎসিৎ কথা।" তারপর বলিবে না বলিবে না করিয়া, শুভার মা'র শুনিবার আগ্রহে, রাখুর চরিত্রগত এত কুৎসা মধুঠাকুর তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, শুভার মা'র পিপাসু কর্ণও রাখুর ততটা নিন্দা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রাখু চিরটা-কাল যাত্রার দলে ঢোল পিটিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছে। তার স্ত্রী স্বামীর চরিত্র

দোষের জন্য জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কুলীন হইলেও এই চালচুলা নাথাকা চরিত্রহীনটাকে আর কেহ কন্যাদানে সাহসী হয় নাই, স্বভাবের দোষের জন্য, যে মামীর বাড়ীতে সে আজন্ম মানুষ হইয়াছে, সেখানেও আর তার স্থান নাই। তার মামী—রাখুর মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—হতভাগাটাকে বাড়ীতে রাখিতে সাহস করে নাই। পেটের দায়ে কলিকাতায় আসিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়া বোকা কর্ত্তামশায়ের চোখে সে ধূলা দিয়াছিল। 'বাবু' নিতান্ত সরল, মা', ঠাকুর মা—ইহারা ত মাটীর মানুষ—ইহাদের যে সে ধূর্ত্ত সহজে ভুলাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সাধু সাজিলে কি হইবে, স্বভাব ত আর পরিচ্ছদে ঢাকা পড়ে না! ডুব দিয়ে জল খাওয়াত চিরদিন চলে না, বাছাধন পূর্ব্বরাত্রিতে একটা 'নটীর' ঘরে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছেন।—সমস্ত কথা বিনাইয়া বিনাইয়া মধু শুভার মাকে শুনাইল।

তবে কে যে রাখুকে ধরিল, আর কে যে সে কথা প্রকাশ করিল, একথা মধুসূদন হিসাব করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু ধরা পড়াটা যে ঠিক্, একথা সে শালগ্রাম ছুঁইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত ছিল।

সে রকম অসৎ স্বভাবের লোক দিয়া ত আর ব্রজেন্দ্র বাবুর মত মহৎ লোকের বাড়ীতে পূজার কাজ চলিতে পারে না, তাই ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা বিপত্তির মধুসূদনকে আবার সেখানে আসিতে হইয়াছে।

আরও কতক্ষণ তাহারা কথা কহিত ঠিক ছিল না, কেননা উভয়েই যে যার কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিল, যদি না নির্ম্মলা মধুর ঠাকুর ঘরে প্রবেশের অযথা বিলম্ব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইত।

তাহাদের উভয়কেই দু'একটা মিষ্ট তিরস্কার করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নির্ম্মলা তাহাদিগকে কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার না বলা কিছু বলার অপেক্ষা অধিক তিরস্কারের কাজ করিল। দুইজনেই অপ্রতিভের মত ক্ষণেক নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শুভার মা যখন দেখিল, কোনও কথা না কহিয়া, তাহার সপত্নীপুত্রবধু :চলিয়া যায়, তখন তাহাকে শুনাইয়া মধুকে বলিল—"যাও মধু, বউমা পূজোর আয়োজন ক'রে এসেছে। বাবু তোমাকে যখন আস্‌তে বলেছেন তখন তোমার অপরাধ কি।"

"বাবু আসতে না ব'লে পাঠালে আসব কেন ঠাকুর মা!"

উভয়ে উভয়দিকে চলিয়া গেল।

ঠাকুরের অন্নভোগ শুভার মা রাঁধিত এবং ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিত।

ব্রাহ্মণ গৃহের বিধবা সে, অন্যের সে-অন্ন-স্পর্শের অধিকার ছিল না। থাকিলে, নির্ম্মলা নিজেই তাহা ঠাকুর ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাইত, ওই মিথ্যাবাদী বামুনটার মুখ হইতে রাখুঠাকুরের নিন্দা শুনিতে শাশুড়ীর অমন আগ্রহ দেখিয়া তাহারও উপরে তার এমন রাগ হইয়াছিল। মধু কি বলিয়াছে যদিও সে শুনে নাই, কিন্তু রাখুর চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অনেক কথা বলিয়াছে, ইহাতে নির্ম্মলার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, রাখু পূজা করিতে আসুক আর না আসুক ও বামুনকে সে কখনই পূজারি নিযুক্ত হইতে দিবে না।

অনেকক্ষণ পুঁটিকে কোলে করিতে পারে নাই, আর এক ঝিয়ের কোলে দিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়াছে কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতায় নির্ম্মলা সর্ব্ব নিম্নতলে সদরে রাহির হইবার দূরে উপস্থিত হইয়াই যেই ডাকিল 'ঝি', অমনি পিছন দিক হইতে শুভা তাহাকে ডাকিয়া উঠিল—"বৌদি!"

নির্ম্মলা পিছনে চাহিয়াই দেখিল শুভা।

"কি র‍্যা।"

"পুরুত মশাই চলে যাচ্ছেন কেন?"

কে পুরুত নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মলা দেখিল শুভার একহাতে ছাতি, অন্য হাতে গরদের কাপড়।

"চলে গেলেন!"

"বোধ হয় গেছেন। আমার হাতে এই দু'টো দিয়ে বললেন, তোমার বউদি'কে দিও। আর ব'ল আমার এখানে খেতে আসা হবে না, আজই আমি দেশে যাব।"

"তিনি চলে গেলেন কি না একবার দেখে আসবি শুভা।"

"বাইরে যাব?"

"তুই যা, কেউ কিছু বলে, জবাবদিহি আমার।"

শুভা চলিল, একটু দ্রুতই চলিল। নির্ম্মলা আবার তাকে বলিল—"দেখতে পাস্ ডেকে আনবি, আমার নাম ক'রে।"

ক্রমশঃ

রূপকথা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ]

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মানসিক সম্প্রসারণ শিক্ষা দিবার জন্য দেশী ও বিদেশী অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ আবৃত্তি কেহ কণ্ঠস্থ করা কেহবা পড়িয়া যাওয়ার পক্ষপাতী! কিন্তু অত্যন্ত শিশুকালে আমাদের মনের মধ্যে যে শক্তি জাগ্রতী হইয়া থাকে তাহারই উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা কেহই বড় বেশী করে না। বিস্ সাহেবের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার খসড়ায় দেখা যায় যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য সে সব শিক্ষার উপায় ও পন্থা কল্পিত হইয়াছে, তাহা এদেশের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। অথচ আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি স্বাধীন দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সব দেশে যাহাতে শিশু হৃদয়েও স্বদেশ-প্রেম, ভাবুকতা ও নির্ভীকতা জাগিয়া উঠে প্রাথমিক শিক্ষার মূলে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে 'প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ,' 'শিশুশিক্ষা,' 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী নানাকারণে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ এই সব পুস্তক তোতাপাখীর মত পড়ান হয়, তাহাতে শিশুচরিত্রে উন্মেষিত না হইয়া স্তিমিতশক্তি হইয়া পড়ে।

শিশুচরিত্রের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ এই যে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা গল্প শুনিতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আঁধারে বদ্ধ গৃহে ঠাকুরমা, দিদিমা, ঠানদিদি, রাঙাদিদি ও নূতন বধূরা যে সব গল্প, ছড়া রূপকথা ও হেঁয়ালি বলিয়া যান, তাহাতে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য অনেক। ছোট ছোট শিশুরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া নিদ্রাজড়িত নয়নে ছোট ছোট একটা 'হু' দিতে দিতে কখন যে তাহাদের কোলে লুটাইয়া পড়ে, তাহা তাহারাই জানে না। শিশুরা চোখের দেখা ও কানের শোনা এই দুইটারই পক্ষপাতী। কিন্তু চোখের দেখা পুস্তকের লাইন দেখা নয়, ইহা ছবি দেখা। একটা গরুর বর্ণনা অপেক্ষা সেই গরুটাই তাহারা সশরীরে দেখিতে চাহিবে। মনের ভিতরেও তাহারা অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া যায় কেননা তাহাদের কল্পনা শক্তি খুবই প্রবল। মানসিক ভাবরাজি তাহাদের খুব তীক্ষ্ণ,—ভয়, প্রীতি, স্নেহ, বিস্ময়, আনন্দ, দয়া প্রভৃতি সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলিই অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া এত তীক্ষ্ণ। তাই কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহাদের 'trailing clouds of glory' বলিয়াছেন। শিশুরা কান দিয়া শুনিতে চায়— সঙ্গীত, ছন্দ, মিত্রাক্ষর রচনা, লীলায়িত গতি কবিতা; আর চোখ দিয়া দেখিতে চায়— বিচিত্র রেখার বিচিত্র অঙ্কন, ছবি, বর্ণচিত্র, আকার দেওয়া ভাব। তাহাদের নির্ম্মল মনটা গোধূলির আলো—আঁধারে ভরা; তাহারা কি চায় ও কি না চায়—তাহা তাহারাই ঠিক ভাল করিয়া জানে না। তাহাদের মন কখনো সচল রেখায় চলে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভুবনবিখ্যাত ক্রেস্কোগ্রাফে শিশুচিত্তের অবস্থা আঁকিলে ঐ রকম একটা হিজি-বিজি গ্রাফ তৈরি হইত। তাই যে-সব কবিতায় তরঙ্গায়িত ছন্দ ও সুললিত শব্দ সমাবেশ আছে, সেগুলি শিশুদের বড় আদরের; আর যে সব কাহিনীতে অদ্ভুতত্ব ও চিত্রপূর্ণ ঘটনা আছে, সেগুলিও তাহাদের বড় আদরের।

গল্পে তাহারা যা শোনে, তাহা সহজে ভোলে না। কারণ গল্পের ঘটনাগুলি ছবির মত তাহাদের মনের সুকুমার পটে আঁকিয়া যায়। সেই জন্য অনেক পাশ্চাত্য প্রাথমিক শিক্ষায়তনে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রভৃতি গল্পের ভিতর দিয়াই শেখানো হয়। ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি আবার অনেক সময়ে অভিনয় করিয়া দেখানো হয়। হুমায়ুন ও শেরসাহের নীরস ঘটনাগুলি সরস করিবার জন্য একজন ছাত্র হুমায়ুন ও অন্য একজন শেরসাহ সাজিয়া ব্যাপারটা অভিনয় করিয়া যায়। ইহাতে হুমায়ুন ও শেরসাহের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাজত্বের ঘটনাবলীও বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমেরিকার অনেকস্থলে গ্রামোফনের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু আমরা আমাদের স্বদেশী রূপকথারই পক্ষপাতী।

রূপকথা—অর্থাৎ কথা বা কাহিনী যেখানে রূপ ধরিয়া মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে। রূপের ভিতর দিয়াই ছেলে মেয়েরা গল্প শুনিতে মজিয়া যায়। তাই God save the king কবিতার আবৃত্তি বাঙ্গালী জীবনে নিরর্থক। পুস্তককারের প্রথম হইতেই চেষ্টা—বাঙ্গালীদের পরম রাজভক্ত প্রজা করিয়া তোলা। সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র জানি, শিশু জীবনে ঐ গানটী না শিখিয়া ডি, এল, রায়ের 'আমার জন্মভূমি' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' শিখিলে বাঙ্গালী বালকের জীবন সার্থক, মঙ্গলময় ও পুণ্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। শিশু জর্জ ওয়াশিংটন চেরীগাছের ডাল কাটিয়াও পিতার কাছে নির্ভীকভাবে দোষ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী বালকের পক্ষে সত্যবাদিতার এই নজীর সম্পূর্ণ নিরর্থক। সত্যের জন্য বালক প্রহ্লাদ যাহা করিয়াছিল বা

শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন তাহার মূল্য ও সার্থকতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ভূতের রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়া শুনিয়া বুড়া বয়সেও আমাদের গাত্র-চর্ম্ম রোমাঞ্চই রহিয়া গিয়াছে, হাম্বা-রব শুনিয়াও দিনের মধ্যে অনেকবার আমাদের মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

রূপকথার কয়েকটা বিভাগ মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—

(১) কাল্পনিক।

(২) পৌরাণিক।

(৩) ঐতিহাসিক ও

(৪) জীবন-চরিত বিষয়ক।

এই চারপ্রকার রূপকথার মধ্যে নিতান্ত শিশুদের জন্য প্রথমটীরই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া উচিত। রাজপুত্র দুধের মত সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বিজন বনের নিবিড় আঁধারের মধ্যে একাকী নির্ভয়ে ছুটিয়াছেন, টুকটুকে ঘুমন্ত রাঙা বউ পাবার জন্ম নয় স্তর গ্যালাহাডের মত জীবনের আদর্শের সন্ধানে। কারণ পরিণত বয়সেও শিশু টুকটুকে রাঙা বউএর মধুময় স্বপ্নটা মন হইতে তাড়াইতে পারে না। আলতার মত গাল, নবনীর মত ফুটন্ত কোমল দেহ, ফুলের মধু খাওয়া মুখ, মেঘের মত চুল, সোণার কাটি দিয়ে ঘুম পাড়ানো ও রূপার কাটি দিয়ে সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বর্ণ পালঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ,—এ সবের যথারীতি পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা, ঠান্‌দিদিরা তাঁহাদের চিরপুরাতন অথচ চির তরুণ গল্পগুলি হইতে এই সব রসাল অংশ বাদ দিতে চাহিবেন না জানি কিন্তু একটা জাতিকে মানুষ হইতে হইলে অনেক পুরাণো জিনিষ ভুলিতে হয় ও নূতন জিনিষের সম্যক্ গ্রহণ করিতে হয়। হাজার হাজার ভীষণ দর্শন ভৈরব রুদ্র রাক্ষস,—তাহাদের প্রাণ আছে একটী ছোট ভোমরার ভিতর; সে ভোমরাটী প্রমোদ সরোবরের যতই তলায় থাক ও কাশির কৌটার মত যতই গোলক-ধাঁধার মধ্যে সুরক্ষিত থাক, একবার কোন ক্রমে সেটাকে ধরিয়া 'পাশ পেড়ে কেটে ভুঁয়ে না রক্ত ফেলবেই' অমনি কেল্লা ফতে ;— হাজার হাজার রাক্ষস এক নিমেষে ধরাশায়ী হইবে। বুড়া বয়সেও এইরূপ রাক্ষস মারা আমাদের খুব সোজা কাজ হইয়া থাকে। শাঁকচুন্নি, পেত্নী, ভূত, ব্রহ্মদৈত্য কবন্ধ প্রেত, ডাইনী—বাঙ্গলার দিবস রজনী ভরিয়া বর্ত্তমান। তাহাদের এ পর্য্যন্ত মারা গেল না, যদিও রাক্ষস মারা কত সোজা!

এইরূপ অনেক সুন্দর রূপকথা শিশুজীবন হইতেই আমাদের মানসিক

বিকার উপস্থিত করে। ইহাদের পরিবর্ত্তনের ভার নবীনা বধুদের উপর দিলে আগামী বংশীয়েরা আবার মানুষ হইয়া উঠিবে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত-বিষয়ক গল্পগুলি শিশুদের নিকট সরস ও কৌতুহলোদ্দীপক করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান রূপকথার যে বিরাট saga বা 'মহাবংসো' আছে তাহার এখনও ভাল করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় এই কথাসাহিত্য ইতস্ততঃ ভাসমান শৈবাল-দলের মত অবহেলায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, উজ্জ্বল প্রভাত, হাসি অশ্রু, জয়-পরাজয় এই সব সামান্য কথা সাহিত্যের সঙ্গে চির বিজড়িত রহিয়াছে। যখন শীতের সুদীর্ঘ অলস সন্ধ্যাগুলি ঝিল্লীমন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠে, স্বর্গের প্রফুল্ল কোমল দেবদূতগুলি যখন সারাদিনের আমোদ কোলাহলে শ্রান্ত হইয়া স্নেহময়ীর অঞ্চল লগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে, যখন সংসারের সব কাজ সারা হইয়া গিয়া একটী নিবিড় শান্তির জন্য সমস্ত চিত্ত ক্ষুধিত ব্যথাতুর হইয়া পড়ে,—তখন আমাদের স্নেহময়ীরা তাঁহাদের তরুণ জীবনের অরুণ স্বপ্নের মঞ্জুষাগুলি গাঢ় অনুরাগভরে একে একে উন্মোচিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের এই স্নেহের দান লাভ করিয়া আমরা সেই দানের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। 'এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী'—এই রকম সরল ভাবে গল্প আরম্ভ করিয়া আমরা কত মতিমহল, শীষমহল, দেওয়ান-ই-খাস্, আরাম বাগ কল্পনায় পার হইয়া যাই; কত মুগ্ধা, কত অভিমানিনী, কত রূপসী আমাদের শিশুচিত্ত কমল আগামী যৌবনের মোহন পূর্ব্বরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া যায়; কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত তেপান্তরের মাঠ বায়স্কোপের ছবির মত শব্দের নির্ঝরে আমাদের কল্পনা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে; আর সেই জুজুবুড়ী,—অমনি আমাদের মুখে চোখে ভয়ের অন্ধকার, হৃদয়ের দারুণ শঙ্কা, ঠিক কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের দশা—

> 'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখংচ পরিশুষ্যতি।
> বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥''

বৈষ্ণব কবিদের 'হিয়া দুরু দুরু পরাণ কাঁপনি!'

স্বীকার করি, সব দেশের কথাসাহিত্যেই অলৌকিক ও অবস্থা কাহিনীর সমাবেশ আছে। কিন্তু সে-সব গল্প ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইবার জন্য

প্রায় কথিত হয় না। আমাদের গৃহের নবীনা মাতারা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে শিশুদের দুরন্তপনা সহিতে না পারিয়া তাহাদিগকে অযথা জুজুর হাতে তুলিয়া দিতে চান; বাস্তবিকই জুজু মহাশয় তখন হইতেই শিশুচিত্তে জগদ্দল-পাথরের মত চাপিয়া বসেন। তাই পরিণত বয়সেও আমরা আশে পাশে জুজু দেখিতে পাই। স্বাদেশিকতা শুধু লেখাবাজি বা বক্তৃতার ফোয়ারায় প্রকাশ করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যময়,পূর্ণায়ত,সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশুর প্রয়োজন হইয়াছে। রূপকথায় কথিত সাহসী রাজপুত্রের মতই বিজন বনের গহন অন্ধকারে একলা ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহাদের চলিতে হইবে—ঘুমন্ত রাজকন্যার তরুণ বিম্বাধরে অনুরাগের প্রথম চুম্বনটী দিবার জন্য নয়,—সেই অনন্ত পথ, সেই তিমির-সঘন রাত্রি, সেই দুর্ব্বার বিপদ, সেই মায়া, সেই ভোজবাজি,—সেই সব উত্তীর্ণ হইয়া নবরুচিরকান্তি অরুণ প্রভাতে সত্য, শিব ও সুন্দরকে বরণ করিয়া লইবার জন্য! রূপকথা কেবল তখনি রূপরসে ভরিয়া উঠিবে, নহিলে নয়। রূপকথা আমাদের অন্তঃপুরের প্রাণশক্তি; রূপকথায় আমাদের দেশমাতৃকার স্বরূপ-প্রকাশ, রূপকথা আমাদের জন্মকোষ্ঠী। শিশুদের নবীন চিত্তের এই স্বাস্থ্যসম্পৎময় স্বদেশী উপাদানটীর প্রতি আর আমাদের উদাসীন হইলে চলিবে না।

গৌতমবুদ্ধ

[অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী]

(ভূপাল রাজ্যের অন্তঃপাতী সাঞ্চীশৈলবিহারের স্তূপ মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি ও মূর্ত্তি প্রভৃতির আভাষ অবলম্বনে লিখিত।) *

(১)

আন্দাজ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬২ অব্দে গৌতমবুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করেন। নেপাল তরাই প্রদেশের প্রাচীন নগর কপিলবাস্তুর নিকটে তাঁহার জন্ম হয়। বোধগয়ার (বুদ্ধগয়া) পিপ্পল বৃক্ষের (বোধিদ্রুমের) তলে বোধলাভ (সম্বোধিলাভ) করিয়াই তিনি 'বুদ্ধ' এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পূর্ব্বে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' এই নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও কয়েকটী নাম ও উপাধি ছিল ; যথা—'শাক্যমুনি,' অর্থাত শাক্যকুলের মুনি ; 'সিদ্ধার্থ,' অর্থাৎ যিনি ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; 'তথাগত,' অর্থাৎ যিনি সত্য লাভ করিয়াছেন বুদ্ধ এই শেষোক্ত নামেই সর্ব্বদা নিজের উল্লেখ করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে বোধিসত্ত্ব কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নানাভাবে নানা স্থানে দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব

---

*Sir John Marshall Kt. মহোদয়ের 'Guide to Sanchi' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধের অধিকাংশই লিখিত হইল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সিদ্ধান্তবারিধি রায় সাহেব মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ' ও শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয়ের 'সারনাথের ইতিহাস হইতেও স্থানে স্থানে অনেক কথা সংকলন করিয়াছি। তাহা ছাড়া প্রাচীন পালি ও বৌদ্ধবিষয়ক সংস্কৃতগ্রন্থ হইতেও অনেক কথা লইতে হইয়াছে। সুতরাং আমি উক্ত সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া—ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, শ্রীযুক্ত মার্শেল সাহেব মহোদয়ের পূর্ব্বেও যাঁহারা সাঞ্চীর ইতিকীর্ত্তির কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের মতামত তুলনা করা বা বিবেচনা করা মোটেই আমার অভিপ্রেত নহে ; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমন কি, সাঞ্চীর স্তূপমালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নিদর্শনগুলিরও উল্লেখ হইতে বিরত হইয়াছি ; কাজেই একটা জটিল টীকাটীপ্পনী দিয়া জমাট জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করি নাই, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মহাপুরুষের জীবন কিরূপে মহামহিমান্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে দেশের ও দশজনের কি উপকার হয় ইহা দেখাইয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণভাবে ইতিহাসের তথ্য জানাও আবশ্যক বটে কিন্তু তাহার উপর আমি বেশী জোর দেই নাই। লেখক।

জন্মে তিনি তুষিত-স্বর্গে জন্মিয়াছিলেন; সেই সময়ে দেবগণ তাঁহাকে নরলোকের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সেই প্রস্তাব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে কোথায় কোন সময়ে কোন বংশে কাহার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন এবং কবেই বা তাঁহার জীবনান্ত হইবে—এই সকল কথা স্থির করিয়া লইবার আবশ্যকতা মনে করিলেন। যথাকাল উপস্থিত হইলে তিনি সাব্যস্ত করিলেন, অন্যান্য বুদ্ধের ন্যায় তিনিও জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন; কপিলবাস্তুর শাক্যকুলের শুদ্ধোধন তাঁহার জনক ও মায়া (বা মায়াদেবী) তাঁহার জননী হইবেন এবং তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার সাতদিন পরেই জননী মায়াদেবী মানবলীলা সংবরণ করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তুষিত-স্বর্গ পরিত্যাগ করেন এবং মায়াদেবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন। মায়া স্বপ্ন দেখিলেন যে ভাবী বুদ্ধ এক শ্বেত হস্তীর কলেবর ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। মহিষী স্বপ্নের কথা রাজার গোচর করিলে, রাজা শুদ্ধোদন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন যে রাণী অন্তঃসত্বা হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভজাত শিশু রাজচক্রবর্ত্তী বা বুদ্ধ হইবেনই হইবেন। গর্ভাবস্থায় চারিজন দিক্‌পাল বোধিসত্ব ও মায়া দেবীকে সকল রকম অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কপিলবাস্তুর সমীপবর্ত্তী লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন; মায়াদেবী প্রসবকালে এক শালবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মানা ছিলেন; প্রসূতি ধরিয়া দাঁড়াইতে পারেন এই জন্য ঐ গাছের একটী শাখা নত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আসিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং চারিজন দিক্‌পাল জননী মায়াদেবীর দক্ষিণ দিক্ হইতে সন্তানকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল সন্তানের শরীরে ভাবী মাহাত্ম্যব্যঞ্জক বত্রিশটী মহাপুরুষ-লক্ষণ (মহাব্যঞ্জক) এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ লক্ষণ সমূহও (অনুব্যঞ্জক) বিদ্যমান আছে। জন্মিবামাত্রই নবকুমার সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং শতবার পদবিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি জগতের শ্রেষ্ঠ"। ঠিক বুদ্ধ যেই মুহূর্ত্তে জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিনী রাহুলজননী যশোধরা, তাঁহার সারথি ছন্দক, প্রিয় অশ্ব কন্থক, ক্রীড়াসহচর কালুদায়ী এবং প্রিয়তম শিষ্য আনন্দও জন্মলাভ করেন।

বোধিসত্ত্বের জন্মদিনে স্বর্গে তেত্রিশ দেবতার মহোৎসবের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। ঋষি অসিত এই মহনীয় দিনের মহোৎসবের সংবাদ পাইয়া দিব্যদৃষ্টির বলে বলিয়াছিলেন যে এই শিশুই ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৌণ্ডিণ্য নামীয় অপর এক যুবক ব্রাহ্মণও এই প্রকার ভবিষ্যদ্‌ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্‌বাদী জ্যোতিষিকগণ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এই নবজাত কুমার কালে চক্রবর্ত্তী হইবেন কি বুদ্ধ হইবেন তাহার নিশ্চয় নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছিলেন যে কুমার যদি সংসারে থাকেন তবে নিশ্চয়ই রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন এবং যদি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে নিঃসন্দেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। রাজা শুদ্ধোধন পুত্র 'রাজচক্রবর্ত্তী' হয়েন ইহাই কামনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, রাজা সকলকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর পাইলেন—চারিটি দৃশ্য—বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসী এই চারিব্যক্তির দর্শনেই কুমারের বৈরাগ্য জন্মিবে। তদবধি শুদ্ধোধন সতর্ক হইলেন; যাহাতে পুত্রের দৃষ্টিপথে কোন বৃদ্ধ বা পীড়িত ব্যক্তির দৃশ্য না পড়ে কিংবা কোন শব বা সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া না যায়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং পার্থিব বস্তুতে যাহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় সেই জন্য নিজে যতদূর পারিলেন যত্নবান্‌ হইলেন এবং যতদূর বা পরের সাহায্যে হওয়া সম্ভব তাহাও করিতে ক্রটী করিলেন না। কথিত আছে, রাজা শুদ্ধোধন একদিন—সম্ভবতঃ 'সক্রোত্থান' পর্ব্ব (ইন্দ্রদ্বাদশী কৃষি সংক্রান্ত পর্ব্ববিশেষ) উপলক্ষে কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে বালক বুদ্ধকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন; এবং একটী জামগাছের তলায় নিজের রথে বুদ্ধকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইখানে ধাত্রীরা কিছুকালের জন্য বুদ্ধকে ছাড়িয়া যায়; বুদ্ধ উঠিয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়েন, অবিলম্বেই তাঁহার সমাধি হয়। এই তাঁহার প্রথম সমাধি। যতক্ষণ তিনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃক্ষছায়া ততক্ষণ তাঁহার উপরিভাগে সমভাবে স্থির হইয়া ছিল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে তাঁহার ভাবি জীবনের উন্নতির বীজ বাল্যকালেই তাহাতে নিহিত ছিল।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কোলিয় নামক রাজবংশের সহিত শাক্যকুলের বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছিল। এই বিবাদের নিঃশেষ ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত কোলিয়-বংশসম্ভূতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরার সহিত ১৬ ষোল বৎসর বয়ঃক্রম

কালে বুদ্ধদেবের বিবাহ দেওয়া হয়। কথিত আছে বুদ্ধদেব সেই সময়ে অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন যুবক ছিলেন; ধনুর্ব্বিদ্যায় কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; দৈহিক বিক্রমে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; নানা কলাবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। শৈশবের ভবিষ্যদ্‌বাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শুদ্ধোধন পুত্রকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন—যাহাতে পুত্র বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়া নিতান্ত বিষয়াকৃষ্ট হইয়া পড়ে দিবারাত্র সেই চিন্তা ও সেই চেষ্টাই করিতেন; এবং যাহাতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে পূর্ব্বলিখিত দৃশ্যচতুষ্টয়ের একটীও না পড়ে সেইজন্য অত্যন্ত সাবধান থাকিতেন। পাছে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কুমারের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসে মন দেয় এই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু যতই যাহা হউক পর পর কয়েকবার রাজকুমারের প্রাসাদের আরামোদ্যানে রথারোহণে ভ্রমণকালে, দেবগণ তাঁহার সম্মুখে সেই রকমের বিষাদ দৃশ্যাবলিই উপস্থিত করিয়াছিলেন; কখনও জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোক, কখনও শীর্ণকলেবর ব্যাধিগ্রস্ত লোক কখনও আবার শবাকার গতপ্রাণ মানবদেহ (মৃত) তাহার সম্মুখে পতিত হইল। এই সকল বিষাদ দৃশ্য দেখিয়া যুবকের হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি করুণার্দ্রহৃদয়ে এই সকলের অর্থ ও কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে জরাব্যাধি ও মৃত্যুসংক্রান্ত সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বুদ্ধদেব নিতান্ত অধীর ও শোকাকুল হইয়া উঠিলেন। অতঃপর চতুর্থ দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল—সুপবিত্র সৌম্যকায় শান্ত দান্ত ও সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের মূর্ত্তি। দেখিয়াই তরুণ তাপসের হৃদয়ে গভীর সংস্কার বদ্ধমূল হইল। ভিক্ষুর সন্ন্যাসমূর্ত্তিই যেন নিজ হইতে তাঁহাকে বলিয়া দিল—সংসারে যে সকল দারুণ দুরাবস্থার দৃশ্য দেখিয়াছ, যদি ইহার উপরে উঠিয়া থাকিতে চাও, তবে সংসার ছাড়িয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবিলম্বেই তিনি ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সমাধি অবলম্বন করিতে মনঃস্থ করিলেন। একদিন রাজপ্রসাদের নিদ্রাগত পরিচারিকা নারীবর্গের ঘৃণাকারজনক উচ্ছৃঙ্খলদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সংকল্প আরও দৃঢ় হইল; তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেই নিজ পুত্র ও পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই বুদ্ধদেবের মহাপ্রস্থান বা প্রব্রজ্যা (মহাবিনিক্রমণ)। এইরূপে ২৯ উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধদেব সত্যের অনুসন্ধানে সংসার হইতে বিনিক্রান্ত হয়েন। তাঁহার প্রিয় অশ্ব কন্থকে আরোহণ করিয়া তিনি নগর অতিক্রম করিলেন;

পাছে নগরের লোক কোন প্রকার শব্দে জাগরিত হইয়া উঠে এইজন্য দেবতারা সকাল অশ্বের ফোঁস ফোঁস শব্দ নিবারণ করিয়া তাহার পদ চতুষ্টয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অতি সত্বর নগরে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে দুর্ম্মতি মার (কন্দর্প বা কামদেব) গৌতমের অনুসরণ করতঃ তাঁহাকে নিখিল জগতের রাজচক্রবর্ত্তী পদের প্রলোভন দেখাইয়া লক্ষভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু, বলা বাহুল্য তাহার সেই চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইল।

অদূরে অনোমা নদীর পরপারে পৌছিয়া গৌতম তাঁহার বিশ্বস্ত সারথির হস্তে নিজের অলঙ্কারপত্র সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে স্বহস্তস্থিত তরবারির দ্বারা নিজের কেশগুচ্ছ কাটিয়া লইয়া শিরস্ত্রাণের সহিত তাহা উর্দ্ধে আকাশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"যদি আমি ভাবী বুদ্ধই হই—ইহাই ঠিক, তবে এই কেশদাম উর্দ্ধেই অবস্থান করুক নতুবা অচিরাৎ শিরস্ত্রাণের সহিত ইহা ভূপতিত হউক"। বলা বাহুল্য কেশরাশি নিমেষ মধ্যে উর্দ্ধে উধাও হইয়া গেল এবং সুবর্ণ পুটিকার মধ্যে স্বর্গের এয়স্ত্রিংশদেবতার সমীপে নীত হইয়া রহিল। অতঃপর দেবদূত ঘটিকার ব্যাধের বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহার সহিত নিজের পোষাক পরিচ্ছদ বদলা বদলি করিয়া এবং সংসার ত্যাগের চিহ্ন স্বরূপ ঘোড়া লইয়া সারথিকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া একাকী পদব্রজে রাজগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় রাজা বিম্বিসার অবিলম্বে আসিয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন; এবং নিজ রাজপদ পর্য্যন্ত গৌতমবুদ্ধকে ছাড়িয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইয়া তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আমি পূর্ণ মনোরথে স্বয়ং আপনার রাজ্যে আবার প্রত্যাগমন করিব। তথা হইতে গৌতম উরুবিল্বার (পালি উরুবেল) পথে প্রস্থান করিলেন। উরুবিল্বা মগধের পুণ্যভূমি গয়া নগরীর সন্নিকটে কোন গ্রাম বিশেষ। এইখানে বোধিসত্ত্ব কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিয়া নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ছয় বৎসরকাল এইরূপ তপশ্চর্য্যা চলিল। তখন বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন যে তপস্যায় শরীরের কৃশতা সাধন দ্বারা জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আবার তিনি পূর্ব্ববৎ ভিক্ষুর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার পাঁচজন অনুচর (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ) তাঁহার প্রতি অনাস্থা পরায়ণ হইয়া অশ্রদ্ধায় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং কাশীর সন্নিধানে মৃগদাবে (বর্ত্তমান 'সারনাথ') গিয়া অবস্থান করেন। বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীরতীরে গমনপূর্ব্বক নিকটস্থ

কোন গ্রামবাসীর কন্যা সুজাতার হস্তে সেই দিবস প্রাতরাশ ভক্ষণ করেন ভক্ষণান্তে সুজাতা যে সুবর্ণপাত্রে অন্নাদি আনিয়া দিয়াছিলেন তিনি তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যদি অন্তই আমি বুদ্ধ হইতে পারি তবে এই ভোজনপাত্র স্রোতোজলে উজান বাহিয়া উঠুক ; নতুবা এই দণ্ডেই জলধিমগ্ন হউক।" আশ্চর্য্য যে সেই পাত্র কিয়ৎকাল স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া জলমগ্ন হইল এবং নাগরাজ কালের বাসভূমিতে চলিয়া গেল।

সেই দিবস সায়ংকালে বোধিসত্ত্ব বোধগয়ায় পিপ্‌পলীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তদবধি সেই বৃক্ষ 'বোধিদ্রুম' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। পথে স্বস্তিক (পালি, সাত্থির) নামে এক ঘাস-বিক্রেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার নিকট বুদ্ধ আট আটি ঘাস লইলেন এবং বোধিদ্রুমের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক অবলোকন করতঃ ঐ বৃক্ষের পূর্ব্বভাগে সমস্ত ঘাসমুষ্টি ছড়াইয়া দিলেন। পরে তাহার উপর বসিয়া বুদ্ধ বলিলেন,—"যদিও আমার অস্থি, চর্ম্ম, মাংস সমস্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, যদিও আমার শরীরের শোণিত জীবনীশক্তির বিলোপসাধন করিয়া শুষ্ক হইয়া পড়ে, তথাপি আমি যতদিন না সত্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বহুকল্পেও সুদুর্লভ সেই সংবোধি লাভ করিতে না পারি, ততদিন এই যে বসিলাম, বসিলাম ; এই পরিগৃহীত আসন আর পরিত্যাগ করিব না।" বলা বাহুল্য, ইহার পরেই দুরন্ত ও পরের অভ্যুদয়ে কাতর মন্মথের আক্রমণ ও প্রলোভন আরও বাড়িতে লাগিল ; কন্দর্প নানা উপদ্রবের অবতারণা করিয়াও তাঁহাকে উদ্দেশ্যবিমুখ করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। তাহার অসুর প্রকৃতিক দলবলের ভীষণ অত্যাচার ও নিদারুণ উৎপাতের ভয়ে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বচর দিক্‌পাল দেবগণও পলাইয়া গেলেন। কেবলমাত্র 'তথাগত' সেইখানে একাকী নিজের সিংহাসনে স্থির ও নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। দুরাচার মার ভীষণ বাত্যা-প্রবাহিত করিয়াও তাহার নিষ্কম্পিত শরীরকে কম্পিত করিতে পারিল না। তাঁহার উপরে অবিশ্রান্ত উপলখণ্ড, তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র জ্বলন্ত অঙ্গার ও ভস্মরাশির অভিবর্ষণ হইতে লাগিল ; তথাপি তিনি কোনমতেই বিচলিত হইলেন না বা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সেইগুলি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই কোমল কুসুমে পরিণত হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া সকলেই অবাক্! বোধিসত্ত্ব তখন সিদ্ধির আর দেরী নাই জানিয়া জয়লাভের মহা-নন্দে ধরিত্রীর দোহাই দিলেন এবং নিজের আসনে বসিয়া নিজের কাজ

করিবার অধিকার তাঁহার নিজেরই আছে এই কথা জানাইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দেবী ধরিত্রী মহাশব্দে সেই আহ্বানের উত্তর দিলেন। দুরাচার মন্মথের সৈন্যগ্রাম সেই শব্দে ভয়াকুল হইয়া লজ্জানত মুখে প্রস্থান করিল। দেবগণ উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'জয় সিদ্ধার্থের জয়! এতদিনে দুর্মদ কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল!' অবিলম্বে নাগলোক প্রভৃতির সমস্ত প্রাণীরা আসিয়া সিদ্ধার্থের জয়গান করিতে লাগিল। তখন সায়ংসূর্য্য অস্তমিতপ্রায়; বোধিসত্ব প্রকৃতই শত্রুদল পরাজয় করিলেন এবং সেই রজনীযোগেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। চিরবাঞ্ছিত সংবোধি তাঁহার করায়ত্ত হইল। রজনীর প্রথম প্রহরে, তিনি জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সমস্ত জ্ঞানলাভ করিলেন; দ্বিতীয় প্রহরে জীবজগতের যাবতীয় অবস্থা তাঁহার বিদিত হইয়া গেল; তৃতীয় প্রহরে, কার্য্যকারণ পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল; এবং রজনী প্রভাত হইলে কোন বস্তুর কোন বিদ্যাই তাঁহার অবিদিত রহিল না;—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন।

এইরূপ সংবোধি লাভ করিয়া উদ্‌বুদ্ধ বুদ্ধদেব ৪৯ দিন উপবাস করিলেন। সুজাতা তাঁহাকে পূর্ব্বদিন যে অন্নপ্রদান করিয়াছিলেন তাহার বলেই অমানুষিক শক্তিতে এতদিন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এই সুদীর্ঘ সাত সপ্তাহকাল বুদ্ধ নানাস্থানে যাপন করিলেন। প্রথমতঃ বোধিদ্রুমের তলে বা নিকটে;—এইখানে তিনি তাঁহার মুক্তির ফলভোগ করিলেন এবং অভিধর্ম্ম পিটকের সমগ্রাংশ প্রচার করিলেন; অতঃপর অজপালের ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) মূলে, এইখানে সেই সদ্ধর্ম্মের শত্রু মারের রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা তাঁহাকে লোভের ফাঁদে ফেলিবার প্রয়াস করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই; তৃতীয়তঃ মুচিলিন্দ (মুচলিন্দ) বৃক্ষের ছায়ায় এইখানে নাগরাজ মুচিলিন্দের ফণা তাঁহাকে বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে, রাজায়তন বৃক্ষের নিম্নে,—এইখানে সপ্তম সপ্তাহের শেষদিনে ত্রপুষ ও ভল্লিক নাম্নীয় দুই সহোদর তাঁহাকে আহারার্থ যবের রুটী ও কিছু মধু আনিয়া দেয়। এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, বুদ্ধদেবের কাছে এমন কোন পাত্র না থাকায় চারিজন দিকপাল তাহাকে তৎক্ষণাৎ চারিটী পাথরের বাটী আনিয়া দেয়। তথাগত স্ব-আজ্ঞায় তদ্দণ্ডে সেই চারিটী প্রস্তর পাত্রকে একটিতে পরিণত করিয়া তাহাতেই অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করেন। বণিকদ্বয় তাঁহার প্রতি নিজেদের সম্পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার প্রার্থনা

জানাইলেন। বুদ্ধও তাহা পূরণ করিয়া অনতিবিলম্বে তাহাদিগের দুই জনকে বৌদ্ধসংঘের প্রথম উপাসকরূপে দীক্ষিত করিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মায়ের ডাক

[শ্রীসত্যকুমার মজুমদার বি, এ]

১

শিবপুরের হারাণ বিশ্বাসের ছেলে পুলিন যে দিন তার সমপাঠী ক্লাসের ভালছাত্র প্রবোধ বসুকে ১০০ শত নম্বরের নীচে রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিল, সে দিন প্রবোধ যে শুধু নিজেকে একলা অপমানিত মনে করিয়াছিল তা নয়, স্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্র এমন কি দীঘলিয়া গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই তাহাতে নিজেদের অসম্মান বোধ করিয়াছিল। এই অশিক্ষিত নমঃ শূদ্রের ছেলেটা ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে পেছনে ফেলিয়া উপরে উঠিবে, তার মত অসম্মানে তাহাদের আর কি হইতে পারে! হারাণ বিশ্বাস নিজে সরস্বতীর সুনজরে পড়িবার সুযোগ না পাইলেও মা কমলার শুভদৃষ্টি তার উপর একটু বেশী পরিমাণে বর্ষিত হইয়াছিল। শিবপুরের নমঃ শূদ্রেরা সকলেই কৃষিজীবী। খাওয়া পরার ভাবনা তাঁহাদের বড় ছিল না। বিশেষতঃ এই কয়বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অনেকেই বেশ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। হারাণ বিশ্বাসের অবস্থা ছিল সব চেয়ে ভাল। বিশ্বাস মহাশয় বাল্যকালে একবার মা সরস্বতীর ঘরে যাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছেন তাই তার দৃঢ় সংকল্প পুলিনকে মানুষ করিবেন।

বিশ্বাস মহাশয় যেদিন পুলিনকে প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান সেদিন প্রবোধের পিতা যোগেন্দ্র বসু তার বৈঠকখানায় বসিয়া ডাকিলেন, "কি হে হারাণ তোমার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে গেলে না কি? এ সব দিকে ঝোঁক তোমাদের কবে থেকে হ'ল হে?"

হারাণচন্দ্র উত্তর করিলেন, "ঝোকটা অনেকদিন থেকেই ছিল বোস মশাই! ভাগ্য দোষে নিজে কিছু শিখ্‌তে পারিনি দেখি ছেলেটার যদি কিছু হয়।"

বসু মহাশয় তামাকটা পুরা দমে টানিয়া বলিলেন, "তা তোমাদের ত এ কাজ নয় হারাণ! তাই বলছিলুম কি, হয় ত কিছু শিখ্‌তে পার্‌বে না মাঝ খান থেকে চাষ বাস নষ্ট হবে।"

হারাণচন্দ্র জানিতেন এরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন ভদ্র আখ্যাধারী প্রতিবেশীর নিকট হইতে তিনি নিরুৎসাহ ছাড়া বড় বেশী কিছু আশা করিতে পারেন না। হারাণচন্দ্রের অর্থবল ছিল তাই বুকের জোরটাও নেহাৎ কম ছিল না—অমনি মুখের উপর বলিয়া উঠিলেন, "তা বোস্ মশায়ের ত এতে মাথা ব্যাথা হওয়ার কারণ দেখ্ছি না। লেখাপড়া শিখাটা কারো নিজস্ব জাতিগত পেশা নয়। আর আমরা এমন নূতন কাজও কিছু কর্ছি না। আর আর জায়গায় আমাদের জাত বেশ শিক্ষিত হয়ে উঠ্ছে—এই শিবপুরেই কেবল মা সরস্বতীর পদার্পণ হয়নি। তা রাগ করবেন না বোস মশাই যে কতকটা আপনাদের দোষে! বাবা যখন আমাকে স্কুলে দিতে এসেছিলেন তখন এই গ্রামের অনেক ভদ্রলোক আপনার মত ঠিক এমনি—পরামর্শ দিতে এসেছিলেন। তা সেদিন আর নেই বোস্ মশায়।"

মুখের মত জবাব পাইয়া যোগেন্দ্র বাবু আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বেটার দুটো পয়সা হয়েছে কি না আর মাটিতে পা দিতে চায় না।"

আজ পুলিন ক্লাসের প্রথম হইয়া বসুমহাশয়কে দেখাইয়া দিলেন যে মা সরস্বতী কোন জাতি বিশেষের একচেটিয়া নন।

ক্লাসের প্রমোশনের দুইদিন পরে যোগেন্দ্রবাবু হেডমাষ্টার গিরীশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মাষ্টারবাবু, আপনারা স্কুলে সব মুচি মুদ্দফরাস ভর্ত্তি ক'রে তাদিকে প্রথম ক'রে দিবেন এতে ভদ্রলোকদের মান থাকে কোথায়।"

হেডমাষ্টার বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "স্কুলটা শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থের জন্য নয় বোস্ মশায়। এই যে আপনাদের একটা মজ্জাগত জাতিহিংসা এইটাই দেশের যত সর্ব্বনাশ করছে। এই গোঁড়ামিটার দোষেই আপনারা দেশটাকে উৎসন্ন ক'রে ফেল্‌লেন। বড় হ'তে হ'লে কাউকে বাদ রেখে বড় আপনি কি বল্‌তে চান পক্ষপাতিত্ব করে আমরা ফাষ্ট্ সেকেণ্ড করি!"

বসু মহাশয়ের গাত্রজালা হেডমাষ্টার বাবুর কথায় আরও বাড়িয়া গেল। একেই ত শিবপুরে তার কয়েক ঘর নমঃশূদ্র প্রজা তাহাকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে না, তার উপর লেখাপড়া শিখিলে ত জমিদার বলিয়া খাতিরই করিবে না। বসু মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ওদের শিক্ষার পথটা বন্ধ করিতে সারা যায়। কাজে তিনি বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না,

অধিকন্তু শিবপুরে তাহাদেরই উদ্যোগে একটা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

যোগেন্দ্রবসু গ্রামের মধ্যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বড়লোক হইলেই তার কতকগুলি পার্শ্বচর থাকেই। এই একদল অকর্ম্মণ্য লোক পিতা পিতামহের উপার্জ্জিত অর্থ বসিয়া বসিয়া ধ্বংস করে, আর পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়! সন্ধ্যায় যোগেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় তাহাদের এক আড্ডা পড়িয়া যাইত।—দুই একছিলিম গঞ্জিকার আরাধনাও যে না হইত এমন নয়।

বসু মহাশয় তার পার্শ্বস্থিত রাম ভট্টাচার্য্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন ভট্টাচার্য্যমশায় দেশের ছোট লোকেরা বড় মেতে উঠেছে। এদের না থামালে আর ভদ্রলোকের মান থাকবে না।"

ভট্টাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "সে বটেই ত বোস মশায়! আমাদের যতীনও তাই বল্‌ছিল। সে বল্লে সে আর পড়্‌বে না। ভদ্রলোকের সম্মান তাহ'লে থাকবে না। ছোটলোকদের সঙ্গে সাম্‌নে বস্‌তে হয় তারপর মাষ্টার নাকি তাকে দিয়ে কাণ মলিয়ে উপরে তোলে।"

ভট্টাচার্য্য তার গুণধর পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বসিলেন। তাঁর পুত্রটী আবার এমনি গুণধর যে তিন বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে ফেল হওয়ার পর হেডমাষ্টার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া প্রমোশন লইয়াছিল। এবার বাৎসরিক পরীক্ষায় নম্বর পাইয়াছে অঙ্কে ০, ইংরেজীতে ১৩, ইতিহাসে ৫, আর বাঙ্গলায় ২৩।"

বসু মহাশয় বলিলেন, "দেখ ত চক্রবর্ত্তী কত বড় অন্যায়। হেডমাষ্টারকে বলতে গেলুম, বেটা আমায় দুকথা শুনিয়ে দিলে। বেটা কেবল দেশ দেশ করে মরছে। ১০০ টাকা মাইনের চাকর আস্পর্দ্ধাটা দেখত। ভদ্রলোকের মান থাকল না সেটা আবার দেশ!"

চক্রবর্ত্তী বাম হাতে হুকা নামাইয়া বলিলেন, "ও বেটার কথা ছেড়ে দাও যোগেন। বেটা বামুনের ছেলেই নয়। বেটার জাত ভেদ জ্ঞান নাই-খৃষ্টান—খৃষ্টান। সেদিন মুসলমান পাড়ায় গিয়ে কেমন তাদের সঙ্গে এক বিছানায় ব'সে কেবল বকে যাচ্ছিল—দেশ—দেশ—দেশ! তা সেক্রেটারী রায় মশায়কে বল না কেন, তিনি ত সদ্‌ ব্রাহ্মণ।"

বসু মহাশয় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সে ও বলে দেখেছি ভায়া। ছেড়ে দাও ওদের কথা! দেশে কি আর ব্রাহ্মণ আছে। যা তুমি আর এই

ভট্টাচার্য্য মহাশয়। দিন দিন সব খৃষ্টানীভাব ধরছে। বলে—জাত মেন না ছোটদের বড় কর। তাই নাকি খাঁটি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ঘোর কলি—ঘোর কলি —সব সৃষ্টি ছাড়া কথা।”

২

জীবনে যত লোকের কাছে পুলিন উৎসাহ পাইয়াছে, তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহদাত্রী ছিল অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হরকুমার কবিরত্নের কন্যা। অল্প বয়সেই পণ্ডিত মহাশয় অন্নপূর্ণার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে সে বালবিধবা। পণ্ডিত মহাশয় অন্নপূর্ণাকে যথেষ্ট সৎ-শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবসর মত তিনি কন্যাকে দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন—যাহাতে তাঁর অভাগী কন্যা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মপথে মতি রাখে। দর্শন শাস্ত্রে গীতার কর্ম্মবাদটা অন্নপূর্ণার কাছে বড় ভাল লাগিত। কিন্তু সে বিধবা যুবতী কুলবালা, সংসারে তার কি কাজ থাকিতে পারে! সে তার কর্ম্মহীন জীবনটা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইবার ভার অন্নপূর্ণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতিবাসীর রোগে শোকে অন্নপূর্ণা ছিল সকলের মাতৃস্থানীয়া। হরির ছেলের অসুখ, অন্নপূর্ণা রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। হারাণীর মেয়ের জ্বর, দুধ সাগু খাইবে, ঘরে দুধ নাই —দুধের বাটী লইয়া অন্নপূর্ণা হারাণীর দ্বারে উপস্থিত।

এত করিয়াও অন্নপূর্ণার সময় কাটিত না। দীর্ঘদিন যেন ফুরাইতে চাহিত না। অন্নপূর্ণা ভাল উলের কাজ জানিত। ছেলে মেয়েদের টুপী মোজা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া সে যে পয়সা পাইত তাহাতে দরিদ্র কবিরত্ন মহাশয়ের কম সাহায্য হইত না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হাতে পৈতা কাটার অভ্যাস তাহার ছোটবেলা হইতেই ছিল। কিন্তু পৈতা বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে পাপ—কাজেই অন্নপূর্ণা প্রয়োজনের অধিক পৈতা কাটিত না।

ঘরের মাচার উপর বহুকালের পরিত্যক্ত একটা অর্দ্ধ ভগ্ন চরকা দেখিতে পাইয়া অন্নপূর্ণা পিতাকে বলিল, “এটা কি বাবা?”

কবিরত্ন মহাশয় চরকাটা বাহির করিয়া বলিলেন, “এটা চরকা, এতে আগে সুতো কাটা হ'ত তাই দিয়ে যে কাপড় হ'ত তাই ছিল সকলের পরিধেয়। এই যে বিলেতী কাপড় এটা খুব বেশী দিনের আমদানী নয়। আমিই খুব ছোট বেলায় হাতে কাটা সুতোর কাপড় পরেছি।”

অন্নপূর্ণা চরকা লইয়া বলিল, "আপনি আমায় তুলো কিনে দিবেন আমি সুতো কাটব।"

পিতা কন্যার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সুতো দিয়ে কি হবে মা, কে কিনবে? বিলেতী ভাল সুতো খুব কম দামে পাওয়া যায়।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "কেন বাবা, প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিব। ভাল হলে ত পুরস্কার দেবে।"

পণ্ডিত মহাশয় কন্যার ক্ষমতার সন্দিহান ছিলেন না তাই তার ইচ্ছামত তুলা কিনিয়া দিলেন।

অন্নপূর্ণা মাঝে মাঝে তাঁতী পাড়ায় বেড়াইতে যাইয়া তাহাদের কাজগুলি বেশ পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে দেখিত। কৃষ্ণ বসাকের কন্যা তারি মত বালবিধবা। সংসারে তাদের কেউ ছিল না—এক বিধবা জননী আর সে নিজে মায়ে ঝিয়ে তাঁত চালাইয়া তাদের বেশ চলিতেছিল। অন্নপূর্ণা একদিন ললিতাকে বলিল, "তোদের এতে চ'লে ত ললিতা?"

ললিতা উত্তর করিল, "চলবে না কেন দিদি ঠাকরুণ! বিলেতী কাপড়ের জ্বালায় তেমন লাভ হয় না। তা খরচ বাদে আমাদের ১০।১২ টাকা থাকে বইকি।"

বাড়ী আসিয়া অন্নপূর্ণা পিতাকে বলিল, 'আমাকে একটা তাঁত পেতে দিন না!"

কবিরত্ন মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "একেবারেই খেপে গেলে নাকি মা!"

এ হেন অন্নপূর্ণা ছিল পুলিনের উৎসাহ দাত্রী আর উপদেষ্টা শিক্ষয়িত্রী। বিধবা হইলেও তার মোটেই "ছুৎমার্গ" রোগ ছিল না। তাই পুলিন যেদিন একটা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিল, অন্নপূর্ণা এই ছেলেটাকে কেন যেন স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অতবড় একটা ছাত্রের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলে তার মত যুবতী বিধবার পাছে কোন দোষের কাজ হয়, অন্নপূর্ণা তাই তার ছোট বোন সুরবালাকে দিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে পুলিনের পরিচয় লইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন উদার প্রকৃতির লোক বিশেষতঃ পুলিনের স্বভাব চরিত্রে তিনি একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। অনেক চেষ্টাতেও তিনি পুলিনে সংস্কৃত কাগজে ৫টী নম্বরের বেশী কাটিতে পারিতেন না

এইরূপে যাতায়াত আলাপ পরিচয়ে পুলিন পণ্ডিত পরিবারের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। হারাণ বিশ্বাসের টাকা পয়সার অভাব ছিল না—পুলিনেরও একটা প্রকাণ্ড প্রাণ ছিল,—তাই দীঘলিয়ার অনেক দরিদ্র ভদ্রপরিবার অভাবের সময় পুলিনের অর্থ সাহায্য পাইত। সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান চাউলের দর বড় বাড়িয়া গিয়াছিল, পুলিন নিজের গোলা হইতে ২৫/০ মন ধান দরিদ্র অনাথ ভদ্রপরিবারের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিলাইয়া দিয়াছিল।

পুলিনের হাতে ঔষধের শিশি দেখিয়া অন্নপূর্ণা বলিল, "এত দৌড়ে শিশি হাতে কোথায় যাচ্ছ পুলিন?"

পুলিন অন্নপূর্ণাকে দূর হইতে প্রনাম করিয়া বলিল, "রমেশ বাবুর ছেলের বড় অসুখ তাদের ডাক্তার বাড়ী যাবার লোক নেই এই ঔষধটা দিয়ে আসি।"

অন্নপূর্ণা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল; "তুমি পারবে পুলিন, ছোট থেকে বড়, মানুষ থেকে দেবতা কি করে হওয়া যায় তা তুমি জান।"

পুলিন হাসিয়া বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ দিদি, আমায় শিখিয়ে দিবেন কি করে মানুষ হওয়া যায়।"

অনেক দিন হইতেই অন্নপূর্ণা এই ছেলেটীর প্রত্যেকটা কাজ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। অন্নপূর্ণা কি একটা প্রবন্ধে পড়িয়া ছিল,—যে জাতি যখন জাগে তাদের মধ্যে তখন অনেক আত্মত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। অন্নপূর্ণা পুলিনের ভিতর সেই ত্যাগীর ছায়া দেখিতে পাইয়া মনে মনে বলিত, বাঙ্গালী আবার উঠিবে সাধারণের ভিতর হইতে যদি এমন সন্তান বাহির হয়—তবে বাঙ্গলার দূর ভবিষ্যৎ নেহাৎ অন্ধকারময় হইতেই পারে না।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া পুলিন কলিকাতা আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলে মেসে থাকা লইয়া প্রথমে তাহাকে বড় বেগ পাইতে হইয়াছিল। হারাণ বিশ্বাস বিরক্ত হইয়া পুলিনের জন্য ছোট একখানি বাসা ভাড়া করিয়া দিলেন সমস্ত অসুবিধা শেষ হইয়া গেল।

৩

পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা সুরবালা চোদ্দ পার হইয়া পনেরতে পা দিয়াছে, আর তার বিবাহে বিলম্ব করিলে চলে না। পণ্ডিত মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র ৩০০ শতটী টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ৫০০ টাকায় সুরবালার বিবাহ হয় না। যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ করেন

বরকর্ত্তা ৫০০ শত টাকার কমে কিছুতেই স্বীকার করেন না। কাজেই বিবাহও হয় না।

একদা পণ্ডিতগৃহিণী নথ নাড়া দিয়া বলিলেন, "মেয়েটার ত বিয়ে দিতে হবে। বাড়ী ঘর যা আছে বন্ধক দিয়ে দু'শো টাকা ধার করে ফেল।"

পণ্ডিত মহাশয় ম্লান মুখে বলিলেন, "বাঁধা না হয় দিলুম কিন্তু টাকা শোধ কর্‌ব কি ক'রে! এই ৩০টী টাকা মাহিনে এতেত খোরাক্ জুটানই ভার!"

গৃহিণী একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তা কি কর্‌বে বল! মেয়েকে ত আইবুড়ো ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্ম দেওয়া কত জন্মের মহাপাপের ফল! পুলিন আমাদের বাড়ী আস্‌ত-জান ও পাড়ায় কি কলঙ্কের কথা-রটেছে। বলে পুলিন ত ওদের সাহায্য কর্‌বেই-ঘরে দুই দুইটী সোমত্ত মেয়ে!"

"নারায়ণ, নারায়ণ" পণ্ডিত মহাশয় কাণে আঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, "তা যোগেন বোস্‌দের বাড়ী ও সব কথা হয় বুঝি?

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "শুধু বোস্‌দের বাড়ী হবে কেন ভট্টাচার্য্য বাড়ীতেও হয়।"

কবিরত্ন মহাশয় অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা বলুকগে তারা। রাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীত! তার ঐ গুণধর পুত্রের জন্য আমাদের স্বুরকে চেয়েছিল। না হয় তার ক'টি টাকা আছে তা বলেত মেয়েটাকে একটা গাধার হাতে তুলে দিতে পার্‌ব না। বাপে গাঁজা খায়—ছেলে আবার গাঁজা মদ দুটোই ধরেছে। আমার দেওয়া আমি দেখেই দিব—ভিটে ছাড়া হ'তে হয় তাও স্বীকার।"

এমন সময় পুলিন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিল।

পণ্ডিত মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পুলিন যে, কল্‌কেতা থেকে কবে এলে?"

পুলিন উত্তর করিল, "কাল এসেছি—বড় দিনের ছুটী। দিদি কোথায়!"

অন্নপূর্ণা ঘরে বসিয়া মোজা প্রস্তুত করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া বলিল, "দাওয়ায় উঠে ব'স—এতদিন শরীর ভাল ছিল ত!"

পরদিন পণ্ডিত মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন—"যাই তবে বাড়ীটা বাঁধা

দিয়েই দু'শ টাকা এনে দেখি। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি পার না কর্‌লে দেখছি লোকে আমার দুর্নাম রটাবে। এর চেয়ে বেশী বয়সের মেয়েও কিন্তু ভদ্র-লোকের ঘরে আছে তা স্বর একটু বেড়ে উঠেছে বইত নয়! তবে এটা ঠিক যে এর পর ভিটে ছাড়া হতেই হবে।"

পুলিন ২০০৲ শত টাকার দুই খানি নোট পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ভিটে ছাড়া হ'তে হবে কেন পণ্ডিত মশাই। আপনার মত দেবতার যদি কন্যাদায়ে ভিটে ছাড়া হ'তে হয় তবে তার চেয়ে বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দশা আর কি হ'তে পারে! একটা ব্রাহ্মণ কন্যার জাত রক্ষার জন্য ভগবান এই ছোট লোকটার হাতে দু'চারটী টাকার অভাব ক'রে দেননি।"

পুলিন পণ্ডিত মহাশয়কে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই বাহিরে আসিতেছিল, পাছে তিনি টাকা গ্রহণে অস্বীকার করেন! কিন্তু বড় ঘরের দাওয়া হইতে অন্নপূর্ণা যখন ডাকিল, "পুলিন।" পুলিনকে তখন বাধ্য হইয়াই ফিরিতে হইল।

অন্নপূর্ণা বলিল, "অত উচুতে দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌লে ভাল হয় না তা তোমায় অনেকদিন বলেছি।"

অন্নপূর্ণার কথার মর্ম্ম গ্রহণ না করিতে পারিয়া পুলিন বলিল, "বুঝতে পার্‌লুম না দিদি কি মনে ক'রে আপনি বলছেন। এই টাকা ক'টির কথায় কি?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "শুধু টাকার কথায় কেন, সংসারে যারা উঁচুতে দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌তে থাকে, এত উঁচু যে মানুষ তাদের লাগালই পায় না, তাদের কাজ বুঝতে না পেরে সাধারণে তাদের কার্য্যে দোষ দেখতে থাকে। তাই মানুষের মধ্যে কাজ কর্‌তে হলে একটু নীচুতে নেমে আস্‌তে হয়।"

পুলিন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তবে কি অসময়ে মানুষ মানুষকে সাহায্য কর্‌বে না?"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিল, "আমি কি বলছিরে পাগল; সাহায্য ত কর্‌বেই সেইটাই ত মানুষের কাজ। তবে অযাচিত আত্মীয়তা—অযাচিত করুণায় মানুষ বিশ্বাস কর্‌তে চায় না যে করুণাময়ের তাতে কোন দুরভিসন্ধি বা স্বার্থ নেই।"

পুলিন বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না কেন আজ অন্নপূর্ণা তাহাকে এত কথা

বলিতেছে। এটা কি তার সত্যিকার কথা না তাহাকে পরীক্ষা করা। যে অন্নপূর্ণা একদিন তাহাকে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিল, যে একদিন জীবের মঙ্গলে তাহাকে অন্নদান করিতে উপদেশ দিয়াছিল। যার উপদেশে সে বুঝিয়াছিল কি করিয়া মানুষের সঙ্গে মিশিতে হয়, কি করিয়া পরকে—অতি বড় শত্রুকেও আপন করিয়া তোলা যায়। সেই অন্নপূর্ণা আজ তাহাকে কি সব বলিতেছে। পুলিন কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিল, "সংসারে বড় বড় কাজ করতে গেলে বড় কষ্ট সহ্য করতে হয়। পুলিন,—তুমি লোকের ভাল করছ মানুষে মনে করবে তুমি মন্দ করছ।'

এবার পুলিন বলিয়া উঠিল, "মানুষের কথায় ত ভাল মন্দ বিচার করা চলেনা দিদি—কাজের ভাল মন্দ তার ফলে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, 'তাইত বলছি পুলিন—ফলটা মানুষ আগেই দেখে না। মানুষ প্রথমটাকে শেষ ধ'রে নিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করে। সেই বিচার আবার এমনি গুরুতর যে সে নিন্দা অপযশ—শত্রুতা কত কি ছাড়িয়ে উঠা বড় শক্ত। পারবে ত?"

পুলিন দৃঢ় স্বরে বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলে কেন পারব না দিদি কিন্তু ভাল কাজ করলেও মানুষ মানুষের শত্রু হ'বে কেন বুঝলুম না।"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "সংসারের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঠিক হ'লে সব বুঝবে। নিজে ভাল ত জগৎ ভাল কথাটা সব জায়গায় খাটে না। এমন লোকও জগতে বিরল নয় যে হাজার ভাল করলেও তাদের কাছে ভাল হওয়া যায় না।"

পুলিন বলিল "তত খারাপ লোকের সংখ্যা কিন্তু খুব কম। জানেন না দিদি, যে প্রবোধ বসু একদিন আমাকে তার শত্রু বলিয়া মনে করত, সে এখন আমার পরম মিত্র। সেবার মেসে তার খুব কলেরা হয়েছিল, সকলে তাকে মেস্ থেকে হাঁসপাতালে যেতে ভয় পেলে। আমি তাকে নিজের বাসায় এনে চিকিৎসা করিয়েছিলুম তার পর থেকে গত ব্যবহারের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইলে। কিন্তু আজও তার পিতার সুনজরে আমি পড়তে পারলুম না। আমাদের জাতটার উপর তাঁর একটু জাতক্রোধ—নইলে—বাধ হয়—।"

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল, "তা জানি পুলিন, ঐ জাত রোগেই ত সব গেল।

কিন্তু তোরা মানুষ হ, জাত তোদের বড় হ'বে। আশীর্ব্বাদ করি ঘরে ঘরে পুলিন তৈরী হোক জাত্যাভিমানী পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে।"

৪

ফরিদপুরের তার কতকগুলি স্বজাতি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে সংবাদ পাইয়া পুলিন কলিকাতা হইতে রওনা হইল। ঐ দলের নেতা পঞ্চানন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "পঞ্চানন বাবু আপনাদের এসব কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে বিধর্ম্ম হ'চ্ছেন কেন?"

পঞ্চানন রায় উত্তর করিলেন, "হিন্দুধর্ম্মকে আপনি সনাতন বলতে চান? যে ধর্ম্মে তার জাত ভাইকে এত ঘৃণার চোখে দেখে, যে ধর্ম্মে সম ক্ষমতাপন্ন মানুষকে এত ছোট করে রাখে সেটাও কি আবার একটা ধর্ম্ম।"

পুলিন মৃদু হাস্তে বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র বোধ হয় রায় মহাশয়ের বেশী দেখা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মে সমক্ষমতাপন্ন ভাই ভাইকে ছোট বলে মনে করেনা। তবে যেটা বাস্তবিক সত্যিকার ধর্ম্ম তা দেশে এত দিন বড় ছিল না আবার জেগে উঠছে। যাকে আপনি ধর্ম্ম বলে মনে করছেন সে একটা কুসংস্কার আর অশিক্ষার ফল হিংসা। সুখের বিষয় হিংসাটা দিন দিন কমে যাচ্ছে নিজ নিজের দোষে ছোট করে রেখে বড়র সমান হ'তে যাওয়া কি খুব যুক্তি সঙ্গত?"

পঞ্চানন রায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি সব বলছেন নিজের দোষে আমরা ছোট করে রেখেছি, তাই বুঝি আমাদের জলটুকু পর্য্যন্ত খায় না?"

"সব দোষটাই যে আমাদের তা আমি বলছিনে তবে বেশীর ভাগ দোষটা যে আমাদেরই, বিচার করে দেখলে অস্বীকার করতে পারবেন না। নিজকে ছোট মনে করার মত বড় দোষত আমরি চোখে আর কিছু পড়ে না। নিজকে আমরা ছোট ভাবি তাই সবাই আমাদের ছোট মনে করে। তবে জল খাওয়াটার কথা বলছেন তাতেই আমি বলতে চাই, উপযুক্ত হ'লে বা আবার ব্যবহার ভাল দেখলে বামুনেও আমাদের হাতে জল খেতে আপত্তি করবে না। দেখুন পঞ্চানন বাবু, দেশে যে বাতাস বইতে সুরু করেছে এতে ওসব গোড়ামি আর বেশী দিন থাকবে না। সহরেত এক রকম অন্ততঃ জল খাওয়ার বিচারটা উঠেই যাচ্ছে। তারপর দেশের যাঁরা নেতা তারা সমস্ত জাত এক ক'রে একটা অখণ্ড হিন্দু জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টায় আছেন। তাই বলে কি

পিতা পিতামহের ধর্ম্মটা ছেড়ে দিবেন। আমাদের মত নিপীড়িত আরও কত জাত আছে। কেউত জল খাওয়াইতে পারে না ব'লে ধর্ম্ম ছেড়ে দিচ্ছে না, ধরুণ না এই যোগী জাতিটার কথা তারা কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত নিচ্ছে নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলতে চেষ্টা কর্‌ছে। ব্যবস্থা ত ব্রাহ্মণেরাই দিয়েছে তাই ব'লে ব্রাহ্মণ সমাজ কি তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায় না তাদের আচরণীয় বলে গ্রহণ করে! তাদের কত বড় দাবী, তাঁরা বলেন একদিন তাঁরা ভারতের রাজন্যবর্গের গুরু স্থানীয় ছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করে তাহাদের বাঙ্গলার নবম গৌরব আখ্যা দিয়েছেন; তাতে তাঁদের কি ফল হ'চ্ছে! যতক্ষণ না তাঁরা নিজের কার্য্যে তাদের পূর্ব্ব গৌরব দেখাতে পারেন ততক্ষণ লোকে মান্‌তে চাইবে না। কতগুলি শাস্ত্র পুথির প্রমাণের উপর নির্ভর করে বড় হওয়া চলে না পঞ্চানন বাবু, এই সুবর্ণ বণিকদের কথাই ধরুন, বাঙ্গালায় তারা ধনে বিদ্যায় চেহারায় কোন্ জাতির চেয়ে হীন? জল তাদেরও কেউ খায় না। খায়না আবার খায়ও। স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণের মত তাদের সম্মান। সে শুধু তারা ভিতর থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে বলে। আর কত নাম করব।"

"আপনি যাই বলুন না কেন পুলিন বাবু, ভদ্রলোকে আমাদিগকে বড় ঘৃণা করে।"

"ঐ ত মশায় দোষ! ভদ্রলোকে ঘৃণা করে। আপনি কি ভদ্রলোক নন? ভদ্রলোকে ঘৃণা করে না, ঘৃণা করে ভদ্র আখ্যাধারী ছোট লোকে। কিন্তু এও ঠিক জান্‌বেন যে যতই তারা ঘৃণা করুক আমরা ভিতর থেকে ভাল হয়ে উঠ্‌লে তাদের সেই ঘৃণা একদিন শ্রদ্ধারূপে পরিণত হ'বে। নিজের ভিতরকার উচ্চতা দেখিয়ে প্রমাণ করুন আমরা বড়। সমাজে শিক্ষার বিস্তার করুন আচার ব্যবহার ভাল করুন, হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থাকুন, সবাই মাথায় তুলে নেবে। তা না করে লাফ দিয়ে ত' গাছে উঠা যায় না। আমরা আছি গাছের গোড়ায়, তারা আছে উপরে, আমাদেরও খানিক উঠতে হ'বে তাঁদেরও খানিক নামতে হ'বে, তবে আমরা তাঁদের লাগাল পাব।"

"তাঁরা সেটুকু নাব্‌বে না কত বড় হিংসা যে নাপিতটা পর্য্যন্ত আমাদের নেই।"

পুলিন ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। নিজের মনের একটা তীব্র দুঃখ চাপিয়া বলিল—"নেই হ'বে। হিংসা যা বল্‌ছেন

ধরতে গেলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে খুব কম। আমি ডাক্তার রায়ের একটা প্রবন্ধে পড়েছি, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এত হিংসা যে ছোট জাতির ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় চলবার অধিকার নেই, উচু জাতিরা তাদের সাম্নে আসা ত দূরের কথা, তাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। তারাই অস্পৃশ্য। বাঙ্গালায় তেমন অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। আমাদের উঠবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁরা ক'রে দিয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই হ'ল। সে চেষ্টা না করে ধর্ম্ম ত্যাগ করলে কি ফল হ'বে।"

"আপনি ছেলে মানুষ জাতিহিংসার কামড় যে কত শক্ত তা এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি রাস্তায় কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়াতে আপনার আলাপ হ'ল, বেশ আলাপ, যেই আপনার নামটী তিনি শুনলেন, অমুক নমঃশূদ্র অমনি তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লেন। তার চেয়ে খ্রীষ্টান হয়ে নামের আগে এলবার্ট কি কিছু লাগিয়ে উপাধিটা ঝালিয়ে ফেল্‌লে কেউ জাতের খবর জিজ্ঞাসাও কর্‌বে না। আর নাক্‌ সিটকাইবারও দরকার ত হবে না।

পুলিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "পঞ্চানন বাবু তা কি কখন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদে পড়েছি—

"নিশি যবে যায় কোন দেশে—
মলিন বদনা সবে তার সমাগমে"

ঐ যে যোগিদের কথা বলেছি না, তাঁদের উপাধি হ'ল নাথ। তার অর্থ প্রভু স্বামী। আর কায়স্থ জাতির সাধারণ উপাধি "দাস" মানে ভৃত্য। কিন্তু প্রভু উপাধি লাভ করেও তদুপযুক্ত গুণ হারিয়ে তারা হীন—আর দাস হয়েও সদ্‌গুণ সম্পন্ন বলে কায়স্থরা শ্রেষ্ঠ। চাই নিজেদের ভিতরকার উন্নতি।"

পঞ্চানন বাবু একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তা যাই বলুন পুলিন বাবু, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিধর্ম্মী চামার হলেও লোকে তাকে ঘৃণা করে না কিন্তু নিজের জাতভাইকে ঘৃণা করা বাঙ্গালীর মজ্জাগত দোষ! হিন্দুজাতির সঙ্গে আমাদের নন্ কোঅপারেশন হওয়াই উচিত। দেখি এতগুলি লোককে ফেলে রেখে বাঙ্গালী কি করে তার অভীষ্ট লাভ করে।"

পুলিন মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, "তাতে ফল এই হবে যে দেশবাসীর চক্ষে চিরকাল ছোট থেকে যাবেন। দেশের ও দশের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফল কোন কালেই ভাল

হতে পারে না! এ সব ছেড়ে দিন পঞ্চানন বাবু, জাতের কথা ভুলে গিয়ে একবার দেশের কথা ভাবুন, আগে দেশ পরে জাত। যতই নিজের দেশকে আপনার বলে মনে করবেন জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ততই চলে যাবে। একদিকে দশের সঙ্গে মিশে নিজকে তাদের একজন মনে করবেন, অন্যদিকে নিজের জাতটাকেও বড় করতে চেষ্টা করবেন। এই যে দেশে বড় বড় কাজের ফর্দ্দ হচ্ছে, তাতে কয়জন নেতা অনুন্নত জাতি থেকে বেরিয়েছে বলুন ত! নামে যারা বড় কাজেও তারা বড়। বড় বড় নেতা তৈরী করে তাদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে শিখান। মায়ের ডাক শুনতে পান্‌নি? সকলেই শুনেছে। আজ সমগ্র ভারতের ঘুম মায়ের ডাকে ভেঙ্গে গেছে। মায়ের ছেলে আমরা সব বড় আর ছোট ভাই। বড় ভাই ছোট ভাইকে ঘৃণা করতে হয় করুক্ আমরা ছোট ভাই মহত্বে বড় ভাইকে ছাড়িয়ে উ'ঠে মায়ের আদরের ছেলে হব পেছিয়ে পড়ে থাকব না আগেই যাব।"

বলিতে বলিতে পুলিনের চক্ষে জল আসিল পঞ্চানন বাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

৫

রাম ভট্টাচার্য্য যত বার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন পণ্ডিত মহাশয় ততবারই অস্বীকার করিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র মনে করিয়াছিল দরিদ্র পণ্ডিত মহাশয় তার মত সুপাত্র আর কোথায় পাইবে! বিশেষতঃ সে যখন টাকা লইবে না তখন পণ্ডিত মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাটী নিশ্চয়ই তার ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে। বিবাহের প্রস্তাবের পর হইতেই যতীন মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীর চারি ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত গান গাহিত আর শিশ দিত। কদাচিৎ সুরবালার দেখা পাইলে কুৎসিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিনীর কাছে পণ্ডিত মহাশয়ের শেষ অসম্মতির কথা বলিতেছিলেন ঠিক তখন বাহির বাড়ী হইতে যোগেন্দ্র বসু ডাকিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বাড়ী আছেন?"

যতীন তাহার পিতাকে ডাকিয়া দিলে বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিয়ে ঠিক হল?"

ভট্টাচার্য্য সক্রোধে বলিলেন, "আর বিয়ে! কবিরত্নকে কত বল্‌লুম, মেয়ের বিয়ে তা কত দেমাক। যতীনের একান্ত ইচ্ছে, তাই একটা পয়সাও চাইলুম

না। সেধে বে' দিতে পারবে না—আমাদের ঘর কি আর ওদের ঘর কি! বেঁচে থাকলে যতীনের জন্য আমি হাজারটী টাকা নেব দেখ্‌বেন।"

বসু মহাশয় উত্তর করিলেন, "তাইত ভট্টাচার্য্য মশায়, মেয়ের বে' দিবে বলে পণ্ডিত মশায় আমার কাছে দু'শ টাকা ধার করতে গে'ছিলেন। তা টাকাই বা কোথায় পেল!"

মাঝখান হইতে যতীন বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি ঐ পুলিনটা টাকা দিয়েছে ঠিক্! গত বড়দিনের সময় তাকে চিঠি লিখে আনিয়েছিল। আজকাল ঐ একরকম জামাই কিনা। না বাবা আমি ও বিয়ে করব না।"

যথা সময়ে সুরবালার বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন তখন কলিকাতায়। তার হাতে তখন অনেক কাজ সে বিবাহে যোগ দিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা পুলিনকে আসিতে লিখিল, পুলিন উত্তর দিল সে যাইতে পারিবে না। এমন কি গরমের ছুটীতেও সে বাড়ী যাইবে না মায়ের ডাকে ছেলেরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেও মায়ের ছেলে। পারে ত পূজার ছুটীতে তাঁহাদের চরণ দর্শন করিবে।

পূজা আসিল। বাঙ্গালী আবার বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া মাতৃমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল। বাঙ্গালার রোগ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনশূন্য পল্লী আবার অনন্ত কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নূতন বস্ত্র নূতন অলংকারের সাজ।

পুলিনও নূতন সাজে সাজিয়া বাড়ী আসিল সে দিন সপ্তমী পুলিন সেই দিনই বাড়ী পৌছিয়েছে। পূজার গোল্‌মালে দীঘলিয়া যাইতে পারে নাই।

সপ্তমীর চাঁদ আকাশে মৃদু মৃদু হাসিতেছে, অন্নপূর্ণা তার গন্ধবিহীন ঝরিয়া পড়া ফুলের মত দেহখানি চাঁদের আলোকে বিছাইয়া দিয়া ভাবিতেছিল তার গন্তব্য আর কতদূর।

এমন সময় সুরবালা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, পুলিন দা এসেছে। আমি ওবাড়ীর শৈলদের সাথে ঘোষদের বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়েছিলুম; দেখি, পুলিন দা বোসদের বাড়ীর প্রবোধের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় জিজ্ঞেস্ করলে কেমন আছ দিদি! আমি তার সাথে কথা কইতে পারলুম না ভট্টাচায্‌ বাড়ীর সেই যতীনটা আমার দিকে কট্‌মট ক'রে চাইতে লাগলো। ঘোস্‌দের বাড়ী ঘু'রে ফিরতে দেখি সে তার কয়জন সঙ্গী নিয়ে বোতল থেকে কি ঢাল্‌ছে আর খাচ্ছে।"

অন্নপূর্ণা উঠিয়া বসিল, বলিল, "থাক্ কথনো ওদের সাম্নে বে'র হোস্‌নে। দেশের মুটে মজুরে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল আর ওরা ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে ছাড়্‌তে পারছে না। আমার ইচ্ছে ছিল না ও'মাতালটার সঙ্গে কথা কই তা দেখ্‌ছি না কইলে আর নয়।"

প্রবোধের হাত ধরিয়া পুলিন অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "একি বেশ ভাই তোমাদের?"

পুলিন উত্তর করিল, "এই নূতন পূজার পোষাক দিদি। মা এসেছেন নূতন পোষাক পরব না। নূতন সবাই চায়—এ সব চেয়ে নূতন।—ঘরের দেওয়া জিনিষ দিদি! আপনি এবার স্বতোকেটে দিবেন—খুব ভাল পোষাক হবে।"

অন্নপূর্ণা উভয়কে আসন দিয়া বলিল, "প্রবোধ, তোমাকে পুলিনের সঙ্গে দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি আজ থেকে তুমিও আমার ভাই।"

প্রবোধ উত্তর করিল, "পুলিনের কাছে সব শুনেছি দিদি, বাবার জন্যে এতদিন আমি ওর সঙ্গে মেশামেশি করতে পারতুম না। তা বাবা আর এখন কিছু বলেন না। অশীর্ব্বাদ করুণ যেন ভাই ভাই এক হয়ে দেশ মাতৃকার দুঃখ দূর করতে পারি।"

অন্নপূর্ণার চক্ষে জল আসিল। অন্নপূর্ণা কেবল বলিল, "আজ আমার দু'টী ভাই!"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল—অন্নপূর্ণা জলযোগ না করিয়া উঠিতে দিল না। পূজাবাড়ীর কোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে, মুখরপল্লী আবার সুপ্তি ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

অন্নপূর্ণা বলিল, "তোমাদের আর যেয়ে কাজ নেই রাত অনেক হয়েছে এখানেই থাক।"

প্রবোধ বলিল, "না দিদি বাবা আমায় বক্‌বেন।"

প্রবোধ উঠিয়া বাহিরে আসিল, পুলিন ডাকিয়া বলিল, "আস্তে হাট প্রবোধ আমিও যাচ্ছি। না দিদি, আমিও যাই আসতে মা কত বারণ করেছিলেন, সকালে চলে আসব ব'লে এসেছি।"

অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া পুলিন চলিয়া আসিতেছিল, সুরবালা দৌড়িয়া পুলিনের হাত ধরিল, বলিল, "পুলিনদা, তুমি যেওনা ভাল হবে না বলছি, কত বড় মাঠ একা যাবে! ভুত প্রেত কত কি রাতে চলা ফেরা করে।"

পুলিন হাসিয়া বলিল, "ভূতের ভয়! ভূত বলে কিছু নেই দিদি! ছেড়ে দাও!"

সুরবালা উত্তর করিল, "ভূত না থাক্ ভূতের বাবা মানুষ ত আছে। তা যাও—"

রাগ করিয়া সুরবালা পুলিনের হাত ছাড়িয়া দিল, পুলিন বাহির হইয়া পথে নামিল। সুরবালা শিহরিয়া উঠিল, সে মাতালগুলির কি একটা দুরভিসন্ধির কথা অল্প অল্প শুনিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া সে অন্নপূর্ণাকে বলিল, "পুলিনদাকে ফেরাও দিদি!"

সুরবালা নিজেই ডাকিল, "পুলিনদা ফে'র!" পুলিন একটু অগ্রসর হইয়াছিল, সুরবালার নারীকণ্ঠ শুনিতে পাইল না। রাস্তার ধারে একটা গাছ গাছের ছায়ায় অন্ধকার। পুলিন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে রে প্রবোধ!"

যতীন ভট্টাচার্য্য বিকট মুখ ভঙ্গি করিয়া টলিতে টলিতে বলিল, "চিন্‌তে পার্‌ছনা বাবা, মজা লুঠে খাচ্ছ। শালা রাতে যাতায়াত সুরু করেছ। তুমি আমার শীকার কেড়ে নিয়েছ, শালা ছোটলোক বামুনের জাত মার্‌ছ।"

"উহু—প্রবোধ!" বলিয়া পুলিন মাটিতে পড়িয়া গেল। এই চীৎকার শব্দে অন্নপূর্ণাও সুরবালা ছুটিয়া আসিল। প্রবোধও অনেক দুর অগ্রসর হয় নাই—সেও ঘটনা কি দেখিবার জন্য দৌড়িল।

যতীন দৌড়িয়া পালাইতেছিল, কিন্তু মদের ঝোকে একএকবার পড়িয়া যাইতেছিল। প্রবোধ বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরাধরি করিয়া পুলিনকে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। কেহ ডাক্তার বাড়ী কেহ শিবপুরে সংবাদ দিতে ছুটিল—সুপ্ত পল্লীর বুকে একটা করুণ আর্ত্তনাদ নৈশ প্রকৃতির জড়তা ভাঙ্গিয়া বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইল।

(৬)

আজ:দশমী পুলিনের মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পার্শ্বে জননী অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। পুলিন ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "মা, কেঁদনা, বাবা কোথায়?"

হারাণ বিশ্বাস পূজার কাজে ব্যস্ত ছিলেন একজন তাহাকে ডাকিয়া দিল। বিশ্বাস মহাশয়ের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই—নীরবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুলিন বলিল, "বাবা, মা কাঁদ্‌ছে, সান্ত্বনা করুন, কেঁদনা মা, এবার আমি যাই আবার আস্‌ব। তোমার ঘরেই আস্‌ব মা আমার কাজ শেষ করে যেতে পার্‌লুম না।"

জননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বিশ্বাস মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "কাঁদ্‌ছ কেন? ছেলেকে আমি মায়ের সেবায় উৎসর্গ করেছিলুম ও আর আমাদের ছেলে নয়। দেবতার জিনিষ দেবতা নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কি! পুলিন, দারোগাবাবু এসেছেন।"

পুলিন উত্তর করিল, "প্রবোধ আগে আসুক।"

জননী চক্ষে অঞ্চল দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। এ কয়দিন পুলিন ইচ্ছা করিয়াই জবানবন্দী দেয় নাই। একটু সুস্থ না হইলে জবানবন্দী দিবে না বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছে।

প্রবোধ আসিল, পুলিন বলিল, "প্রবোধ, যতীনকে থানায় নিয়ে গেছে না?"

প্রবোধ উত্তর করিল, "আর কোথায়! হাতে মুঠে ধরা আসামী। বাঁচবার অনেক চেষ্টা করছে বটে তা'কি আর হয়।"

পুলিন ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "প্রবোধ, ওকে বাচালে হয় না? ওকে মারলে আর কি হবে।"

প্রবোধ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। পুলিন বলিতে লাগিল, "চমকায়ো না প্রবোধ! ওকে বাচাতে হবে; সেই জন্য ক'দিন আমি জবানবন্দী দিইনি। ওত আমাদেরি ভাই! সংশোধন ত শাস্তির উদ্দেশ্য! ওকে যদি ভাল বেসে শোধরাতে পারি। ভাই হয়ে ভাইকে জেলে দেওয়া কি ফাঁসি কাষ্ঠে তুলে দেওয়া ত মায়ের ছেলের কাজ নয় ভাই!"

প্রবোধ কথা কহিতে পারিল না। কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। কেবল বলিল, "পুলিন তুই কি মানুষ।"

পুলিনের অধরে ক্ষীণ হাসি খেলিয়া গেল।—বলিল, "মানুষ! একটা অপদার্থ জীব, ছোটলোক, তবে মায়ের ছেলে, যে তাঁর ডাক শুনেছে। হয় ত আমাকে মারবার উদ্দেশ্য ওর ছিল না। মদের নেশায় হাতের বোতলটা কি আর কিছু আমার মাথায় মেরেছে ওকে মারলে চলবে না ভাই, মানুষ ক'রে তুলতে হবে। আমাকে রাখা মায়ের ইচ্ছা নয় নইলে একটা বোতলের ঘায়ে আমি মরতুম না। দারোগাকে বল প্রবোধ "যতীনকে একা আমার কাছে পাঠাতে হবে নইলে জবানবন্দী আমি দিব না।"

অগত্যা দারোগা তাহাতেই সম্মত হইলেন; বিশেষতঃ রাম ভট্টাচার্য্যের টাকার থলিতে দারোগা বাবুর লোহার সিন্দুক প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল।

কয়েদীকে পুলিনের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, সঙ্গে রাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই গেলেন। ভট্টাচার্য্য যোড়হস্তে পুলিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঁচাও বাবা আমার একমাত্র ছেলেটাকে। তোমাদের স্বদেশী ফণ্ডে আমি দু'হাজার টাকা দিব।"

পুলিন ভট্টাচার্য্যকে যোড় হস্তে নমস্কার করিয়া বলিল, "ছি ছি আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র যোড়হাত হয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ফিরে এসে বাকী কাজগুলো ক'রে যেতে পারি। টাকার লোভ দেখাবেন না। যতীন বাবু প্রতিজ্ঞা করুন, আর মদ স্পর্শ করবেন না জাতিহিংসা ভু'লে যাবেন, আর মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন।"

গৃহ নিস্তব্ধ, সকলে স্পন্দহীন চোখে পুলিনের দিকে চাহিয়া রহিল। পুলিন বলিতে লাগিল "আমি যাচ্ছি আমার স্থান আপনি পূর্ণ করুন। পিতার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন, জীবনে কখনো মিথ্যাকথা কইনি, আজ আপনাকে বাঁচাতে কেবল মিথ্যাই বলে যাব।"

যতীন কাঁপিতে কাঁপিতে পিতার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'জীবনে মদ খাব না,—জাতিহিংসা করব না, মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করব।"

রাম ভট্টাচার্য্যও পৈতা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি আজ থেকে ওকে তোমাদের দলে দিলুম নিজেও ঐ দলভুক্ত হনুম।"

পুলিনের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "বল বন্দেমাতরম্।"

সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল, 'বন্দেমাতরম্'। পুলিন দারোগা বাবুকে আনিতে আদেশ করিল। দারোগা আসিলে পুলিন বলিল, "লিখ্‌তে থাকুন;—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী থেকে আস্‌ছি—রাত্রি অনেক। পথের ধারে গাছের তলায় দেখ্‌লুম যতীন বাবু মদের নেশায় এক একবার পড়ে যাচ্ছেন। আমায় বল্লেন, আমায় একটু বাড়ী রেখে এস ভাই—আমি ধ'রে তুল্‌তে গাছের একটা শিকড়ে বে'ধে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম—হাতের মদের বোতলটা আমার মাথায় নীচে পড়ে গেল তার পর আমার কিছু মনে নেই জ্ঞান হলে দেখি আমি এখানে।"

দারোগা বাবু হাসিয়া জবানবন্দী লিখিলেন। যতীন এবার হাউ মাউ করিয়া উঠিল—গৃহের সকলের চোখেই জল। কাঁদিতে কাঁদিতে যতীন বলিল

"ভাই পুলিন, তুমি বেঁচে উঠ আমায় ক্ষমা ক'রে একবার বল আমি তোমার ভাই।"

পুলিন যতীনের দক্ষিণ হস্ত বুকের কাছে টানিয়া বলিল, 'তুমি আমার ভাই তোমরা রইলে!'

এমন সময় পুলিনের পিতা বলিল, "দারোগা বাবু একটু বাইরে যান, মেয়েরা আস্‌ছে।"

দারোগা বাহিরে গেলেন। অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিয়া পুলিনের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ডাকিল, "ভাই।"

পুলিনের মুখ হর্ষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "দিদি, এই তোমার আর একটী ভাই। একে নাও আমি যাচ্ছি মা আমায় ডাক্‌ছেন। আমি আবার আস্‌ব দিদি, ভাই যতীন তোমরা যখন আমাকে ডাক্‌বে। মা কেঁদনা।"

"ও কি," বলিয়া প্রবোধ চীৎকার করিয়া উঠিল। রক্তে পুলিনের মাথার ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া নীচের বালিশ লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুলিন বলিল, "আঃ কি করছ। মা কেঁদ না, আমি আবার আস্‌ব। দিদি তুমি বেঁচে থে'কো তুমি থাক্‌লে আমার মত অনেক পুলিন তৈরী হবে। মা—মা—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা পুলিনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "যাও ভাই আবার তুমি এস—যেদিন সমস্ত বাঙ্গালী জাতিহিংসা ভু'লে তোমার আগমন প্রার্থনা করবে সেইদিন তুমি এসো। ততদিন ভাই আমার মায়ের কোলে তুমি সুখে বিশ্রাম ক'র।"

হারান বিশ্বাস স্থির চক্ষে দেখিলেন পুলিনের আঁখিপল্লব ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিতেছে। বিসর্জ্জনের বাদ্যে সমস্ত গ্রামখানি তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই দিনই জীবনে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ সেনাবারিকে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইতি পূর্ব্বে এই সেনা বারিকেরই কত অস্ফুট রহস্য মনের আনাচে কানাচে কতবার কতরূপেই না আনাগোনা করিয়াছে, সেদিন সেনাবারিকের মধ্যে বসিয়াও মনে হইতেছিল যেন সেই সকল রহস্য আমাদের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে; মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল কত কালের সুখ স্বপ্ন যেন এই সেনা বারিকের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

লম্বা বারিকের মধ্যে দুই ধারে সারি সারি খাট পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ খাটে বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ বই পড়িতেছে, কেহবা কার্য্যোপলক্ষে বারিকের মধ্যে যাওয়া আসা করিতেছে। আমরা বড় স্ফূর্ত্তিতেই পরিচিত সৈনিকদিগের সহিত কথা কহিতে ছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতর যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, ও আনন্দের এক বিচিত্র আলোড়ন হইতেছিল। প্রথমত যখন ইহারা আমাদের জন্য মিষ্টান্ন আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন আমরা অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ইহাদের আগ্রহ দেখিয়া ক্ষান্ত হই; অথচ যখন মিষ্টান্ন আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল তখন মাঝে মাঝে ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা কিছু ফ্যাসাদ ঘটে, হয়ত বা কোনও কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের বিষয় সংবাদ দিতেই কেহ গিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের সিপাহিরা আমাদের খাটে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। আমরা সেনাবারিকে নিজেদের রাজপুত বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। কেবল রাজপুত দিগের জন্যই বারানসীতে একটি স্কুল ও কলেজ ছিল। রাজপুত ভিন্ন আর কেহ সেখানে পড়িতে পাইত না, অথবা সেখানকার বোর্ডিংএ থাকিতে পাইত না। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটির কথামত আমরা নিজেদের এই রাজপুত কলেজের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। বারিকের সৈনিকেরা আমাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা অম্লান বদনে নিজেদের অমর সিং ও জগৎ সিং ইত্যাদি নাম বলিয়া দিলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেমন একটু ভয় হইতে লাগিল পাছে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমরা নেহাৎ বাঙ্গালী পরিচ্ছদে সেখানে যাই নাই। অমাদের একজনের মাথায় পাগড়ি ও আর একজনের মাথায় টুপি ছিল এবং পরণের কাপড় হিন্দুস্থানী ধরণে পরাছিল। আমি পাগড়ি ভাল বাঁধিতে পারিতাম না বলিয়া অধিকাংশ সময় টুপিই পরিতাম।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটি বলিয়াছিলেন যে একজন হাবিলদারের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন। এই হাবিলদারটির সহিত নাকি তিনি পূর্ব্বেই আমাদের বিষয় লইয়া কথা কহিয়াছেন এবং হাবিলদারও নাকি আমাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। ক্ষনিক পরে হাবিলদারের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। ইঁহার নাম দিল্লা সিং। দিল্লা সিং একটু সঙ্কোচের সহিতই আলাপ করিলেন এবং একটু পরেই একটা কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। আমার কিন্তু দিল্লা সিংকে তখন হইতেই কেমন যেন ভাল লাগেনাই, এবং যখন দিল্লা সিং কাজের অছিলায় কোথায় চলিয়া গেলেন, আমি সভয়ে পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটিকে অতি সন্তর্পনে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিল্লা সিংকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় ত?" অবশ্য সৈনিকটি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে না দিল্লা সিং ভাল লোক। আমার যে দিল্লা সিংকে ভাল লাগিতেছে না এ কথা সে দিনও আমি ইঁহাদের কাহারও নিকট গোপন রাখি নাই। সে দিন দিল্লা সিং যতক্ষণ না পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ততক্ষণ কেবল ক্ষণে ক্ষণে আমার বন্ধুটিকে বলিতেছিলাম "কিহে, এ যে আসেনা, কোথায় গেল?" এবং পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আমরা দুজনাই মুচকি হাসিতেছিলাম। যাহা হউক আমাদের সংশয় দূর হইল, সেদিনের মত দিল্লা সিং পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। এমন সাধারণ কথাবার্ত্তায় সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং পরে আমাদের সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার মানসে দিল্লা সিং সেই পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটিকে লইয়া আমাদিগের সহিত সেনা বারিকের বাহিরে আসিলেন। দিল্লা সিং আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বারিকের আরও অন্যান্য সিপাহিদের সহিত এ বিষয় কথাবার্ত্তা কহিয়া রাখিবেন বলিলেন। দিল্লা সিং চলিয়া যাইবার পরও কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটি আরও কিছুক্ষণ আমাদের সহিত রহিলেন। ইঁহাকে দিল্লা সিংএর প্রতি আমার সন্দেহের কথা পুনরায় বলায়, আমাদিগকে এবিষয় নিঃসন্দেহ হইতে বলিলেন। তখন একজন হাবিলদারকে দলে পাওয়া গিয়াছে মনে করিয়া মনে মনে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। এইরূপ এই

সেনা বারিকে আমাদের যাতায়াত আরম্ভ হইল এবং মাস দুই একের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে আমরা ১০।১২ বার এইখানে যাওয়া আসা করিয়াছি। এই সকল সৈনিক দিগেরও অনেকেই সহরে আমাদের বাসায়ও আসিয়াছেন এবং আমরাও প্রতিবারই রসগোল্লা ইত্যাদি নানারূপ বাঙ্গলা মিষ্টান্ন দ্বারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি।

বোধ করি সারা ভারতে এমন কোনও সহর নাই যেখানে স্বদেশী বোমার দলের কথা কেহ না জানে; আমরাও যে সত্যই ঐরূপ বোমার দলের লোক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই সব সৈনিকদিগকে বাড়ীতে আনাইয়া ইহাদিগকে বোমা, রিভলভার, মশার পিস্তল ইত্যাদি দেখান হইয়াছে। ঐরূপ কিছুদিন যাওয়া আসার পর ইহাদিগকে পাঞ্জাবের সৈনিকদিগের মধ্যেও যে কিরূপ বিপ্লবায়োজন হইতেছে, বলা হইল। ইহাদের নিকট এই সকল ব্যক্ত করায় যে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি ছিল তাহা আমরা জানিতাম, কারণ ইহাদের নিকট হইতে যদি সরকার পক্ষ ঘুণাক্ষরেও এই সব জানিতে পারে ত পঞ্জাবের সকল আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু না বলিলেও সুবিধা হইত না; যখন ইহাদিগকে এইরূপ বলিলাম "যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস না কর ত তোমাদের কাহাকেও অল্প কয়দিনের জন্য পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দাও, আমরা আমাদের মতাবলম্বী সকল রেজিমেণ্টের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিব" তখন আমাদের কথার উপর ইহাদের অনেকটা বিশ্বাস হইল। এই রূপে ক্রমে তিন চারিজন হাবিলদার ও জনকতক সিপাহীদের সহিত আমাদের পরিচয় হয়।

অধিকাংশ সময়ই আমরা সন্ধ্যার সময়ে অথবা :সন্ধ্যার পর বারিকে যাইতাম। কিন্তু দুই একবার দিবা দ্বিপ্রহরেও যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ একদিন আমরা দুইজন বারিকের অদূরে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর ছায়াতলে অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং আমাদের আর একজন বারিকের মধ্যে গিয়া দুই একজন সিপাহিকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সঙ্গীটি ফিরিলেন না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম, ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা কোনও বিপদ ঘটিয়াছে, এবং যদি সত্যই কোনও বিপদ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আর এখানে এরূপে অপেক্ষা করাওত যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু সঙ্গীটিকেইবা ফেলিয়া যাই কেমন করিয়া; ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা আলোচনা করিতে লাগিলাম। যদিও আমাদিগের বিশেষ ভয় হইয়াছিল বটে তথাপি

ভয়ে আমরা অভিভূত হইয়া পড়িনাই, আমাদের বিশ্বাস এতটুকুও বিষাদের কালিমা আমাদের মুখে প্রকাশ পায় নাই। আর যতবারই বারিকে আমরা আসা যাওয়া করিয়াছি, কোন বারই সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যাওয়া আসা করিতে পারি নাই, প্রতিবারই যখন নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি, যাক্— আজকার দিনও নিরাপদে কাটিল; কিন্তু পুনরায় আবার কতবার বারিকে গিয়াছি। যাহা হউক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন বন্ধুটি ফিরিলেন না তখন ভাবিলাম সত্যই বিপদ ঘটিল না কি! ভাবিলাম আমরা বাঙ্গালী, হাতে টুপি ও পাগড়ি, বারিকের অতি নিকটে গাছতলায় ভদ্রলোকের ছেলেরা বসিয়া রহিয়াছে, এই ঘন বৃক্ষরাজির পাশদিয়াই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে, যদি কোনও অফিসার আমাদিগকে এইরূপে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখে ত কি ভাবিবে! ইত্যাদি প্রকারের নানা কথাই আলোচনা করিতেছি, এমন সময় দেখি বন্ধুবর দুইজন সিপাহিকে লইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের মাথা হইতে যেন এক গুরু ভার নামিয়া গেল। ইহার পরে সকালেও দুই একবার এই বারিকের নিকট আসিয়াছি সিপাহিরা তখন কুচ কাওয়াজ করিতেছিল, আমাদেরই পরিচিত জনকএক হাবিলদার সেনা-পরিচালনা করিতেছিলেন দেখিয়া মনে হইল এই রেজিমেণ্ট আমাদেরই নিজস্ব। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যেন এই সকল আয়োজন, সম্মুখদিয়া দুই একজন ইংরাজ অফিসারও অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে, তখন ত কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহের লেশমাত্রও ছিল না।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে। তখন আর একবার পঞ্জাব হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছি, বিপ্লবের আয়োজন সব সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, একদিন সেই ঘন বৃক্ষরাজির পদমূলে বসিয়া ইংরাজ সেনাবারিকের অতি সন্নিকটে ইংরাজ রাজত্বেরই উচ্ছেদকল্পে কি ভীষণ ষড়যন্ত্রই করা হইতেছিল। সেদিন জন তিনেক হাবিলদার ও নায়েক হাবিলদার ও আরও জন কতক সিপাহি সন্ধ্যার পর সেই বৃক্ষমূলে একত্র হইয়াছিলেন, আমরাও তিনজনা ছিলাম। এই বৃক্ষশ্রেণীর এক পাশ দিয়া রেলের লাইন এবং আর এক পাশ দিয়া গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। এই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশে খানিকটা মাঠের পর সেনা বারিক। জন কএক সিপাহি সড়কের ধারে বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া ছিলেন, যদি কাহাকেও সেদিকে আসিতে দেখেন অথবা ঐরূপ যদি কোনও সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় ত তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন।

আমরাও যথাসম্ভব বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া আসন্ন বিদ্রোহের দিন, সময় ও অন্যান্য অসংখ্য খুটিনাটির কথা আলোচনা করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে এক কথায় ইহারা সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছিলেন। সেদিন যেন কত যুগের সঞ্চিত রোমান্স মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই অন্ধকারের মাঝে আবছায়ার মত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল; সেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর আবার সেই তাণ্ডব নৃত্যের মহা আয়োজন হইতেছে ভাবিয়া দেহ মন পুলক-ভরে সত্যই রোমাঞ্চিত হইতেছিল। সেদিন কত আন্তরিকতার সহিতই না তাঁহারা আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ঐরূপ ঘন বৃক্ষরাজির পাদমূলে ঐরূপ গোপনে আমাদের সহিত আলাপ করিবার সময় যদি সৈনিক দিগেরই কেহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সকল বিষয় গোচর করাইয়া দিত তাহা হইলে ত কোর্টমার্শলে তাঁহাদের প্রাণ লইয়া কতই না বিপন্ন হইতে হইত। এই জন্যই সেদিন বৃক্ষমূলে আসিয়াই তাঁহারা ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কারণ ঐরূপ আয়োজনের মধ্যে যেন লুকোচুরির ভাবটা অতি সহজেই চোখে পড়ে, সেই জন্য আমি ঐরূপ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিবার প্রয়াসের বিরোধী হইয়াছিলাম এবং ঐরূপে বার বার সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে বারণ করিয়াছিলাম। আমরা যখন যেখানে ঐরূপ পরামর্শের জন্য নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করিতাম, তখন ইহা আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতাম যেন সহজ সরল ভাবটা সর্ব্বসময়ে বজায় থাকে। সেদিন কিন্তু ঐরূপ বারণ করা সত্ত্বেও যখন সিপাহিরা আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করিলেন তখন মনে মনে এই ভাবিলাম, যে ইহারা নিতান্ত সরলপ্রাণে ও অত্যন্ত আগ্রহভরেই এখানে আসিয়াছেন, এবং সত্যই এই বিপ্লবের আয়োজনে ইহারা আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছেন। তাই এইরূপে আমাদের নিকট আসা যাওয়া করায় তাঁহাদের প্রাণ লইয়াও টানাটানি হইতে পারে ইহা জানিয়াও, এই সকল বিপদ ঘাড়ে লইয়াও তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের সহিত বিপ্লবায়োজনের পরামর্শ করিতেও পশ্চাদপদ হইতেন না। এইরূপ একবার নহে কতবারইনা তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়াছেন।

এদিকে যেমন আমরা সেনাবারিকে প্রবেশ লাভ করিলাম অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গলা দেশ হইতে ফিরিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকা প্রত্যাগত এক মারাঠা যুবকের আগমনে পাঞ্জাবের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ

পাতাইবার এক নূতন সূত্র পাওয়া গেল। এই মারাঠা ব্রাহ্মণটির নাম পিঙ্গলে। ইহার সম্পূর্ণ মারাঠী নামটি এখন মনে নাই। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে জাহাজেই ইহারা স্থির করেন যে পিঙ্গলে বাঙ্গলাদেশে গিয়া সেখানকার বিপ্লব দলের খোঁজ লইয়া পাঞ্জাবে আসিবেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদের সাহায্যে কলিকাতায় বিপ্লবদলের অনেক লোকের সহিতই ইনি দেখা করেন; ফলে পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের কথা কলিকাতাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এদিকে তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত আমাদের দলেরও সম্বন্ধ ছিল এবং এই সূত্রে পিঙ্গলেকে আমাদের দলে পাওয়া গেল। আমাদের দলের সংস্রবে আসিবামাত্রই তাঁহাকে সোজা কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিঙ্গলে বাঙ্গালাদেশে অনেকের নিকট বোমার সাহায্য চান। সে সময় সারা বাঙ্গলাদেশে প্রধানতঃ আমাদের কেন্দ্র হইতেই বোমা যোগান হইত। সেই জন্য বোমার খাতিরে পিঙ্গলের সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্টতা হইয়া যায়।

ঠিক এই সময় কাশীতে আমাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা জাগিতেছিল, বুঝিবা পাঞ্জাবের সহিত পুনঃ সংযোগ স্থাপন নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িবে; ৫ই ডিসেম্বার পৃথ্বী সিংহের আসিবার কথা ছিল, পৃথ্বীসিং আসিলেন না এবং পাঞ্জাব হইতে আর কোন সংবাদ ও পাওয়া গেল না; এমন সময় পিঙ্গলেকে পাইয়া আমাদের মনে হইল যেন কতদিনের হারান নিধিকে ফিরাইয়া পাইলাম। পিঙ্গলেকে পাইয়া আমরা সত্যই বড় স্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম। পিঙ্গলের সমুন্নত বলিষ্ট দেহ, উজ্জ্বল গৌর কান্তি তাঁহার চোখ মুখের দীপ্তিতে সেই যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস, সেদিন তাহা আমাদের মনে এক সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ইহাকে দেখিয়া, ইহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহাঁর দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হইবে। অতীতের অনেক কথা স্মরণ পথে আসায় আজ যেন মনে হইতেছে যে দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ বলিয়া আমাদের ধারণা, প্রকৃত পক্ষে সে সম্বন্ধ কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠতর।

পিঙ্গলের সহিত মনুষ্য জীবনের আদর্শ বিষয়ে নানা কথা হইতে হইতে কেমন করিয়া মনে নাই গীতার কথা আসিয়া পড়ে, এবং সেই সময় গীতার কএকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া যাওয়ায় আমরা বুঝিলাম গীতা তাহার কণ্ঠস্থ। তিনিও বলিলেন যে পূর্ব্বে যখন তিনি সাধু হইয়া গিয়াছিলেন তখন সমগ্র

গীতাটি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহাতে পিঙ্গলের অতীত জীবনের ইতিহাসের কিছু জানিতে চাহিলে, পরিধানের জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি পূর্ব্বে কেমন করিয়া সাধু হইয়া ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং পরে কেমন করিয়া পুনরায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য আমেরিকা চলিয়া যান, তৎপরে সেখানে গিয়া কেমন করিয়া তিনি এই বিপ্লব দলের সংস্পর্শে আসেন, সব বলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

খদ্দরের গান

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত]

সাত পুরুষের মাটীর' পরে নিজের ঘরে যে ধন পাই,
সাত সাগরের ওপারে তা' কিসের দুঃখে ভিক্ষা চাই ?
মা-বোন আপন হাতের দানে ঘুচা'তে চান দেহের লাজ,—
সোনার মুকুট ধূলায় ফেলে' কোথায় খোঁজ' রাংএর সাজ !—
হোক্‌না মোটা হোক্‌না খাটো, এ যে আমার দেশের দান—
খদ্দরে দে ভদ্র ইতর মাথায় তুলে' রাজার মান। ঐ ॥
দেশের ভূঁয়ে কাপাস থুয়ে' করিস্ কোকো চায়ের চাষ,—
সন্ধ্যা দেওয়ার সল্‌তাটুকু তা-ও না নিজের ঘরে পাস্ !
এই দেশেরই বউ-ঝিয়ারি কাট্‌ত সূতা মস্‌লিনের,
আজ কেন সে বিবির বেশে পুতুল হ'য়ে রয় চীনের ?
চর্কা ছেড়ে' খড়-পাকাটীর ব্যবসা চলে কোথায় আর,—
গলায় দড়ির কোষ্ঠা পেতে' দৃষ্টি হীনের চেষ্টা কার ?
কোন্ দেশে কার্ পত্নী মরে লাজ-না-ঘোচার আপ্‌শোষে ?
অন্নহীনের শব-ঢাকারও চীর জোটেনা কার্ দোষে ?
কোন পুরুষের আঙ্গুল কাটা,—দূর হ'ল না জুজুর ভয়,—
দেড়শো বছর মুলোর মত তাই সয়ে' কার গোষ্টি রয় ?
কোথায় পুরুষ কোথায় নারী,—ঘর-জুড়ে' দে চর্কা-তাঁত,
তিরিশ কোটীর লাগারে ভীড়, গড়ুক্ জোলা-তাঁতির জাত।

এক ক'রে দে গরীব-ধনী,—ঘুচুক্ বিলাস—ভূষার মান ;
ধর্ম্মে কর্ম্মে মনে মর্ম্মে মিলুক্ হিন্দু-মুসলমান ;
সখ্যে মিলুক্ রায়ৎ রাজা, ঐক্যে করুক্ দ্বন্দ্বক্ষয় ;
বাক্যে—সকল নির্ভয়ে বল্—'গান্ধী-মহারাজার জয় !'

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে থিয়েটার কেবল আনন্দ নয়, লোক শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা এক সময়ে বাঙ্‌লার ষ্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইংরাজ নীলকর অতিশয় কদাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্ত্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল ইহাতে ক্লাস হেট্রেড নাকি এমনি একটা ভয়ানক বস্তু আছে যাহাতে অরাজকতা ঘটিতে পারে। অতএব, অবিলম্বে বইখানা ষ্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটার-ওয়ালারা দেখিলেন ঘোর বিপদ। তাঁহারা কর্ত্তাদের দ্বারে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন, হুজুর, কি অপরাধ? কর্ত্তারা বলিলেন লরেন্স ফষ্টর্ নামটা কিছুতেই চলিবে না, ওটা ইংরাজি নাম। অতএব, ওটা ক্লাশ হেট্রেড। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞা প্রভু। ইংরাজি নামটা বদলাইয়া এখনি একটা পর্ত্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ্ না ডিসিল্‌ভা না কি এমুনি একটা—যা মনে আসিল অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন এই নিন্।

কর্ত্তা দেখিয়া কহিলেন, আর এই "জন্মভূমি" কথাটা কাটিয়া দাও—ওটা সিডিশন্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর, এ দেশে যে জন্মিয়াছি।

কর্ত্তা রাগিয়া বলিবেন, তুমি জন্মাইতে পার কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।

'তথাস্তু' বলিয়া ম্যানেজার শব্দটা বদ্‌লাইয়া দিয়া, প্লে পাশ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় সুরু হইয়া গেল। ক্লাস হেট্‌রেড হইতে আরম্ভ

করিয়া যায় সিডিশন পর্য্যন্ত বিদেশী রাজ-শক্তির যত কিছু ভয় ছিল দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন, যাহারা পয়সা খরচ করিয়া তামাসা দেখিতে আসিল তাহারা তামাসার অতিরিক্ত আরও যৎকিৎকিৎ সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহির হইতে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া হয়ত কেহ ছিল না, ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভূত পর্ত্তুগীজ নামটি মিথ্যা। ব্যাপারটাও তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ফল কোনমতেই তুচ্ছ নয়। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের বোধ করি ইচ্ছা ছিল সে সময়ে বাঙ্লা দেশে ইংরাজ নীলকরের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহারই অভিনয়ে ক্লাস হেট্রেড জাগিতে পারে রাজ-শক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক এ আমার আলোচ্য নয়, কিম্বা ইংরাজ নামের পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজ নাম বসাইলে ক্লাস হেট্রেড বাঁচে কি না সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে যাহাতে 'ক্লাস' বলিয়া কোন বস্তু নাই তাহার নিরপেক্ষ বিচারে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করিলে যে বস্তু মরে তাহার দাম ক্লাস হেট্রেডের চেয়েও অনেক বেশি। সেদিন দেখিলাম এই ছোট ফাঁকিটুকু হইতে ছোট ছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের সামান্য পাঠ্য পুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন গ্রন্থকার আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম এই আশ্চর্য্য নামটি আপনি সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? গ্রন্থকার সলজ্জে কহিলেন প্রাণের দায়ে করিতে হয় মশায়। জানি সব, কিন্তু গরিব মানুষ, পয়সা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়াছি তাই ওই ফন্দিটুকু না করিলে কোন স্কুলে এ বই চলিবে না।

তাহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম যে রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যে দেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়, লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন? সে দেশের অসত্য-সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক্ না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গ-মঞ্চ ভদ্র-পরিত্যক্ত পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য! সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের

রক্তের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা ভরসার সে কেহ নয়—সে যেন কোন্ অতীত যুগের মৃত দেহ। তাই পাঁচশত বছর পূর্ব্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে জব্দ করিয়াছিল, এবং কখন কোন সুযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে খোঁচা মারিয়াছিল সে শুধু ইহারি সাক্ষী এ ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছুই নাই! দেশের নাট্টকার গণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাই সত্যবর্জ্জিত নাট্টশালা আজ দেশের কাছে এমনি লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। রুল ব্রিটানিয়া গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু 'আমার দেশ' আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা ও কর্ম্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে নাট্টাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন এতটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা জানালা ভয় ও মিথ্যার অর্গলে আজ এম্‌নি অবরুদ্ধ যে দেশ-জোড়া এতবড় দীপ্তির রশ্মি-কণাটুকু তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায়:নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটিতে পারিত! আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বুকের রক্ত যাহারা এমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন্ দেশের নাট্টশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ এমন করিয়া বারিত হইতে পারিত! অথচ সমস্তই দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত! দেশের কল্যাণের জন্যই আজ!দেশের নাট্টকার গণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁশ বাঁধা। এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে দেশের কবি, দেশের নাট্টকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য, যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শক্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে! কিন্তু এই নির্ব্বিচারে মানিয়া চলার লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে সে ছোট হয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখ ভোগ সেই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে? ঋণ পরিশোধের দুঃখ আছে,—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু দেনা শোধ করিবার তলব যেদিন তাহার ও ভাগ্যে আসিবে সেদিন তাহারই কি মুখে হাসি ধরিবে না!

ব্যাপারটা কাগজে কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিতেছে ঠিক জানি না, হয়ত এই বাঙলা দেশেই এমন মানুষ ও আছেন যাঁহাদের কাছে আগাগোড়া

তুচ্ছ মনে হওয়াও বিচিত্র নয়, এবং যদি তাই হয়, তবুও আরও এম্‌নি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এপ্রসঙ্গ এবারের মত বন্ধ করিব। সেদিন University Institute এ কবিতা আবৃত্তির ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতি-যোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্ব্বদেশ পূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল।

তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে এই সুদীর্ঘ কবিতার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য্য কে করিল!

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্ব্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, রত্ন ইঁহারা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই চোব্‌রা আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা সিডিশন্।

কহিলাম কে বলিল?

ছেলেটি জবাব দিল আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা।

যাক্,—বাঁচা গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্ব্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম আচ্ছা, তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল,—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে প্রকাশ্য সভায় তাহার অবৃত্তি সিডিশন্,—তাহা অপরাধের। এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই, যে ফ্যাসাদ বাধিতে পারে। (ক্রমশঃ)

সুখের ঘরগড়া

দ্বিতীয় ভাগ।

(তারার কথা।)

যজ্ঞেশ্বরী পল্লীবাটী ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভবানীপ্রসাদ পঞ্চুর সহিত দেখা করিতে গিয়া তর্কসিদ্ধান্তের কাছে শুনিলেন পঞ্চু যজ্ঞেশ্বরীকে লইয়া কলিকাতা গিয়াছে; অনুসন্ধানে জানিলেন তখনও আধঘণ্টা হয় নাই। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা না পাওয়াতে ভবানীপ্রসাদ বড় ক্ষুন্ন হইলেন। যজ্ঞেশ্বরী যে অকস্মাৎ তাঁহাকে না জানাইয়া চলিয়া যাইবেন ইহাই বেশী সম্ভব তবু যেন তাহার মনে হইল এই দেখা না হওটায় তাঁহারই ক্রটী হইয়াছে; ভবানীপ্রসাদ মনে মনে তর্ক করিয়া দেখিলেন তখন বেলা এগারটা আন্দাজ, কিন্তু গাড়ী ১।১৫ মিনিটের সময় ষ্টেশনে পৌঁছিয়াও অন্ততঃ তিন কোয়াটার তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইবে; সুতরাং তখনি রওনা হইলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। বেশ বদলাইবার চিন্তা না করিয়া তিনি খালি গায়ে চটী পায়ে সরকারী সড়ক ধরিয়া ষ্টেশনের অভিমুখে চলিলেন।

নেউগী পুকুরের কাছে আসিয়া তত্রস্থ দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন এ পথ দিয়া দুটা পাল্কী ষ্টেশন অভিমুখে কতক্ষণ গিয়া থাকিবে। কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আগেই ঘাট হইতে একটা অস্ফুট বালিকাকণ্ঠ নিঃসৃত চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধা রমণী পা পিছালাইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছেন আর এক কিশোরী সুন্দরী বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে টানিয়া উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। বাক্যব্যয় না করিয়া জুতা ফেলিয়া ভবানীপ্রসাদ ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধাকে টানিয়া তুলিলেন। বৃদ্ধা আঘাতে সংজ্ঞা হারাইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বালিকা ভবানীপ্রসাদকে চিনিল; ভবানীপ্রসাদও তাহাকে কতকটা চিনিলেন তবু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সে তাঁহাদেরই বাড়ীর বাউনঠাকুরাণীর মেয়ে সন্ধ্যামনি। কি করিয়া তাহার ঠাকুরমা পড়িয়া গেল জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিলেন, জলে নামিতে গিয়া পিচ্ছিল ধাপে পা ফস্‌কাইয়া গিয়া পড়িয়া

গিয়াছে। সিড়ির ধাপের উপর বৃদ্ধাকে ধরিয়া বসাইলে সে বসিতে পারিলনা কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল; সন্ধ্যা ঠাকুরমাকে গতপ্রাণা ভাবিয়া হেট হইয়া কাণের কাছে মুখ দিয়া ব্যাকুল হইয়া বার কতক ঠাকুরমা ঠাকু'মা করিয়া ডাকিল, সাড়া না পাইয়া বুড়ী মরিয়া গিয়াছে স্থির করিয়া সন্ধ্যা বসিয়া পড়িয়া ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভবানীপ্রসাদ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "কেঁদনা, তোমার ঠাকুরমার মন্দ কিছু হয়নি; শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন; এখনি জ্ঞান হবে"। এই আশ্বাস বাক্যে সন্ধ্যা যে কত শান্তিলাভ করিল তাহা তাহার সরল সজল দুটী চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল। ভবানী তাহাকে বলিল "চল একে বাড়ী নিয়ে যাই—তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলো কত দূরে বাড়ী?" "ওই বাগান পেরিয়ে,—কাছেই।" ভবানী বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘাট পার হইয়া চলিল। ষ্টেশনে যাওয়ার মতলব ছাড়িতে হইল।

বাড়ী পৌছিয়া সন্ধ্যা দাওয়াতে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল, ভবানীপ্রসাদ বৃদ্ধাকে তাহাতে শোয়াইলেন; এবং সন্ধ্যাকে বলিলেন, "তুমি চটকরে একখানা শুক্‌না কাপড় এনে পরিয়ে দাও তোমার মা কোথা!" সন্ধ্যা বলিল, "মা তো আপনাদের বাড়ীর কাজে গেছে।" ঠিক সেই সময় সন্ধ্যার ছোট ভাই নীলু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত; সন্ধ্যা তাহাকে বলিল, "নীলু মাকে শীগ্‌গির ডেকে আন্, ঠাকুমা জলে ডুবে গিছ্‌লো—"এই বলিয়াই সে ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া অতি সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল "মাকে ডেকে আন্‌বে?" ভবানী উত্তর করিল—"নিশ্চয়ই; তা আবার বল্‌তে?" নীলু ছুটিয়া বাহির হইয়া মাকে আনিতে গেল। ভবানী জলমগ্ন অজ্ঞান ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার পদ্ধতি প্রক্রিয়া জানিত তাহার প্রয়োগ ফলে বৃদ্ধার জ্ঞান সঞ্চার হইল। সন্ধ্যাকে দিয়া একটু গরম দুধ আনাইয়া খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর তাহার গায়ে একটা মোটা কাঁথা চাপা দিয়া কাছে বসিয়া তারামণির আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল ও সন্ধ্যার সহিত কথা জুড়িয়া দিল। একটা ঘটনা লক্ষ করিয়া ভবানী এই মেয়েটীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইল। বৃদ্ধাকে লইয়া আসিবার সময় ভবানী চাতালে দণ্ডায়মান দোকানদারকে ডাকিয়া বলে—"ওহে আমার জুতো জোড়াটা রেখে দিওতো"। দোকানী নাকে তিলক পড়া মালা-ধারণ করা বৈরাগীনন্দন তখন মালা জপিতেছিল। এসময় গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত জুতা স্পর্শে শুচিবিভ্রাট

ঘটিবার ভয়ে সে কথাটা তত গ্রাহ্য করিল না; সন্ধ্যা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল; সে নীরবে জুতা জোড়াটী ভবানীর অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া সঙ্গে আনিয়াছিল।

তারামনি সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিলে, ভবানী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া এবং তাহার পিসি তখন ভাল আছেন, আর ভয় নাই আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইবে এমন সময় সন্ধ্যা জুতা জোড়াটী আনিয়া নতমুখে ভবানীর পায়ের কাছে ধরিয়া দিল। ভবানী জানিত জুতা দোকানেই আছে অথচ এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "জুতা কোথা হতে এলো?" সন্ধ্যা তেমনি নতমুখে মৃদুভাবে বলিল—"দোকানী তুললেন না দেখে আমি নিয়ে এসেছিলাম"। "ছিঃ কেন আনতে গেলে হাতে করে? তোমার কাছে যে খাবার জলের কলসী ছিল?" সন্ধ্যা কি উত্তর দিবে? তারামণি কৃতজ্ঞতা ভরা গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল—"তাতে দোষ হয় নি কিছু কলসীর ও-জল আমাদের কাছে আজ গঙ্গাজল তুল্য হয়েছে"। ভবানী উত্তর শুনিয়া লজ্জিত হইয়া "না ও কথা বলনা বাউন মা"। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভবানীপ্রসাদ চলিয়া গেল। পথে আসিতে এই দুঃখিনী বিধবার সংসারটীর আর সংসারের মধ্যে এই কন্যারত্নটীর কথা ভাবিতে লাগিলেন! খুবই সদ্বংশের মেয়ে যে এই মা ও মেয়ে তা আজ একটী ঘটনায় তাহার প্রমাণ তিনি পাইলেন।

(ক্রমশঃ)

ডালি

[ওকাকুরার Ideals of the East হইতে]

ইউরোপ আজ বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির বলে তোলপাড় হয়ে রয়েছে কিন্তু তাই ব'লে এসিয়ার শান্ত সরল জীবনকে তার সঙ্গে তুলনা কর্ত্তে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচের কোন দরকারই নাই। আমাদের এই বাণিজ্য বিপুল প্রাচীন জগৎ, গ্রাম্য শিল্পী ও পণ্য ব্যবসায়ীর এই কর্ম্ম মুখের ভূভাগ,—যেখানে গ্রামে গ্রামে হাট বসে, যেখানের দেবতার উৎসবে মেলা হয় দেশের পণ্য সম্ভার বুকে করে ছোট ছোট তরণী বিশাল নদ নদী মালার উপরে ভেসে ভেসে বেড়ায় যেখানে প্রাসাদে ও রাজ সভায় বণিককুল আপন আপন মণিরত্ন ও অন্যান্য মহার্হ বস্তু সম্পদে যবনিকার অন্তরালবর্ত্তিনী "ললিতলবঙ্গলতা" ললনাগণকে রত্ন সমুদয় ক্রয় করবার জন্য প্রলুব্ধ করে—আমাদের সে জগৎ এখনও সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে নাই। বাইরে তার আকৃতির পরিবর্ত্তন যতই হ'ক না কেন একটা গুরুতর ক্ষতি না হওয়া পর্য্যন্ত এসিয়া তার আধ্যাত্মিকতাকে ম'রতে দিতে পারে না। কেন না সমগ্র শ্রমশিল্প, যুগযুগান্তরের পৈত্রিক সম্পত্তি, এখনও তারই, এবং সম্পত্তি ত্যাগ করতে হ'লে, এর সঙ্গে, কেবল যে শিল্প সৌন্দর্য্য হারাতে হবে তা নয়, শিল্পীর আনন্দ, তাররূপ দর্শনের স্বাতন্ত্র্য ও সেই সৌন্দর্য্যের মানুষ তৈরি করবার সমগ্র ক্ষমতা এ সমস্তই লোপ পাবে। স্বহস্ত নির্ম্মিত তন্তুজালে নিজেকে ঘিরে ফেলার অর্থ আপন ঘরে আপনাকে বদ্ধ ক'রে রাখা—আত্মশক্তির বিকাশের জন্য।

কালের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে গ্রাস করাই সার ধর্ম্ম। সেই বাষ্পীয় যন্ত্রের তাণ্ডব আনন্দ এসিয়া এখনও জানে না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকের ভিতর দিয়ে প্রকৃত ভ্রমণের নিগূঢ় সার পদার্থটাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে; যিনি গ্রাম্যগৃহিণীগণের নিকটে ভিক্ষা করে অথবা সন্ধ্যা সমাগমে গাছের তলে বসে স্থানীয় যুবক দলের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রকৃত ভ্রমণকারী। পল্লী মায়ের শান্ত কোমল সহজ শোভাই তাঁর কাছে একমাত্র দৃশ্য নয়। তিনি অন্তত মুহূর্ত্তের জন্যও একদিন না একদিন সংসারের সুখ দুঃখের বোঝা নিজেই বহন করেছেন; তার হৃদয়ে আজও যে ভালবাসা ও কমনীয়তার মধু রয়েছে,

তা মানবের উপর, তার জন্মগত সংস্কারের উপর, আচার পদ্ধতি সমাজ রীতির উপর রঞ্জিত হয়ে পড়ে। সেই মহামানবের সঙ্গে একটা সংযোগের ডোর এই পল্লীশোভা গেঁথে দেয়।

আবার দেখি জাপানে কৃষকভ্রমণকারী কোন সুন্দর জায়গায় গেলে, ছোটগান তৈরী না ক'রে—সরল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি না ক'রে, সেখান থেকে চলে যায় না।

এই রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিণত ও জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে,শান্ত বীর্য্যবান মানবতার ভাব ও চিন্তাকে একতানে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। প্রাচ্যে এই রকম আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই মনুষ্যের পরস্পর সংস্রবের অভিব্যক্তি; মুদ্রিত পুস্তকই এখানে সভ্যতার চিহ্ন নয়।:

বৈষম্যের দীর্ঘধারা এমনি ক'রে যতদূর ইচ্ছা জড়ান যেতে পারে; কিন্তু এসিয়ার গৌরব শুধু তাতেই নয়;—এ হ'তে আরও একটা জলন্ত সত্যের দিক আছে, এসিয়ার শুভ্রগর্ব্ব, প্রত্যেক হৃদয়ে যে শান্তির স্পন্দন হচ্ছে, সেই স্পন্দনে সেই প্রাণ বায়ুতে, এসিয়ার গৌরব সেই সাম্যের মহিমাময় একতায় যার জন্য সম্রাট ও কৃষক একপ্রাণ; এসিয়ার বিমল অহঙ্কার সেই সুমহান্ একত্ববিশ্বাসে, প্রেম, ও বিশ্বজনীন সচ্ছলতা যার ফল, যার ফলে জাপান সম্রাট তাকাকুরা তুষারশীতল রজনী অনাবৃত বস্ত্রে যাপন ক'রতেন, কেননা তাঁর দরিদ্র প্রজা শীতে জড়ীভূত, অথবা তাই সে আহার পরিত্যাগ ক'রেছিলেন কেন না প্রকৃতিপুঞ্জ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে পীড়িত। বিশ্বের শেষ পরমাণু পর্য্যন্ত যতক্ষণ অনন্দের রাজ্যে যেতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণলাভ ক'রতে না দিয়ে যে ত্যাগের স্বপ্ন বোধিসত্ত্বকে বিচিত্র ক'রে তুলেছে তাতেই সেই গৌরব। যে স্বাধীনতা কালিমাময়ী মূর্ত্তিতে মহত্ত্বে 'স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলা' ক'রে তোলে, ভারতীয় রাজাকে যোগীর ন্যায় বেশ ভূষায় কঠোরতা শিখিয়ে দেয়; চীনদেশে এমন রাজসিংহাসন গ'ড়ে তোলে যার অধিপতিকে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিপতিকে, কখন তরবারি ব্যবহার ক'রতে হয় না, সেই স্বাধীনতার উপাসনাতেই ত এসিয়ার গৌরব।

এই সবই হচ্ছে এসিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্যকলার গুপ্ত আত্মশক্তি। প্রাক্তন সংস্কার থেকে বিচ্যুত হয়ে, ভারতবর্ষ আজ জাতীয়তার সারভূত ধর্ম্মজীবন বিসর্জ্জন ক'রলে যা নীচ, যা মিথ্যা, ও যা নূতন তারই উপাসক হয়ে প'ড়বে। চীন, নৈতিক সভ্যতার বদলে লৌকিক সভ্যতায় মত্ত হয়ে উঠে,

প্রাচীন আত্মসম্মানও নীতিকে বিসর্জ্জন দেবে,—যে নীতি অনেক কাল আগেই দেশীয় বণিকদের মুখের কথাকেই পশ্চিমের লিখিত দলিলের মত প্রামাণ্য করে তুলেছিল এবং কৃষি সম্পৎ একার্থবোধ বা শব্দের মত ক'রে দিয়েছিল। তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসিয়ার আজকার কর্ত্তব্য—এসিয়ার রীতিনীতি রক্ষা করা ও যা নষ্ট হয়েছে তা ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু তা ক'রতে হলে, তাদের প্রথমে নিজে নিজে ঐ আচার পদ্ধতির জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে নিতে হবে। কারণ যা অতীতের ছায়া, তাই আবার ভবিষ্যতের আশা। বীজে যে শক্তি নিহিত আছে, তা থেকে বেশী শক্তি কোনও গাছের হ'তে পারে না। চিরদিন অন্তর্মুখী হওয়াটাই জীবন। কত ভগবদভক্তই না এ সত্যের প্রতিধ্বনি ক'রেছেন, Delphic oracles এর সব চাইতে বড় কথা "নিজেকেই জান" "তোমাতেই সব" এই হচ্ছে কনফুসিয়সের শান্তির বাণী "আত্মানং বিদ্ধি তত্ত্বমসি" এই একই সত্যের আহ্বান নিয়ে ভারতে যে একটি কথিত প্রচলিত রয়েছে তা আরও প্রাণস্পর্শী। বৌদ্ধেরা বলেন যে একদিন ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণকে নিয়ে যখন বসেছিলেন তখন মহাজ্ঞানী বজ্রপাণি ভিন্ন আর সকলের চোখ হঠাৎ আলা মালায় ঝলসে দিয়ে এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। তিনি মহাদেব শিবশঙ্কর। সাথের সাথীরা অন্ধ হয়ে পড়লো দেখে বজ্রপাণি ভগবানেরদিকে চেয়ে বললেন "দেব বলুন আমাকে এতদিন সমগ্র নক্ষত্র ও দেবতার মধ্যে—সংখ্যায় যারা গঙ্গার বালুকণার সমান, তাঁদের মধ্যে এই জলন্ত শরীর দেখতে পাই নাই কেন? ইনি কে?" বুদ্ধ বললেন "তিনি তুমিই;" এবং বজ্রপানি তখনই ভূমায় মিশিয়ে গেলেন।

এই আত্মবোধের সামান্য কণিকাই জাপানকে পুনর্জ্জীবিত করেছে এবং যে ঝড়ে প্রাচ্যজগতের এতটা ডুবে গিয়েছে সেই ঝড় সইবার শক্তি দিয়েছে। সেই আত্মজ্ঞানের নবজাগরণই এসিয়াকে ধৈর্য্যশালী ও বীর্য্যবান করে গড়ে তুলবে চারিদিক থেকে আশার শতধারা বর্ত্তমান যুগকেবিহ্বল করেছে। বহু তন্ত্র সমাচ্ছন্ন "মোহন্ধ" রাজত্বের সময়েও জাপান আপন ভবিষ্যতের সূত্রটিকে ঠিক করে ধরতে পারে নাই, তবে অতীত নির্ম্মলও বাধারহিত ছিল।

* * * *

কিন্তু আজ প্রাচ্যজগতের ভাবরাশি আমাদের অস্থির কচ্ছে, সত্যই রাজদ্রোহের Revolution সঙ্গে সঙ্গে জাপান তার প্রার্থিত নবজীবন নিয়ে অতীতে ফিরে গিয়েছে বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যেন সত্যের পুনঃ

প্রতিষ্ঠার মত কেননা আশিকগো যা আরম্ভ করেছিলেন সেই কলা সৌন্দর্য্যের প্রকৃতির নিকট আত্মত্যাগ আজ এসে জাতির নিকট মানুষের নিকটে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্বভাবতই জানি যে, আমাদের ভবিষ্যতের পথের খোঁজ আমাদের ইতিহাসেই আছে এবং আমরা অন্ধের মত সেটাকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি ভাব সত্য হয়, যদি অতীতেই নবজীবনের অমৃত উৎস লুকিয়ে থাকে, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই মুহূর্ত্তে একটা মহান্ নবশক্তির প্রেরণার বিশেষ দরকার, কেননা বর্ত্তমানের নীচতা ও ক্ষুদ্রতার জ্বালা, জীবন ও সৌন্দর্য্যকে শুষ্ককণ্ঠ করে ফেলেছে।

সৌদামিনীর যে প্রভাময় তরবারি খানা আজ অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেল্‌বে তারই অপেক্ষায় বসে আছি, এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে হবে, নব-বলের বাধা সম্পাত ধরণীর শুষ্ক হৃদয় সরস হ'য়ে উঠবে তবেইত তার হৃদয় নবীনকুসুমের পেলবকান্তিতে শোভাময় হতে পারবে। কিন্তু সত্যের মহান্ আহ্বান শুনতে পাওয়া যাবে এসিয়া থেকেই, জাতীয়তার প্রাচীন রাজপথে চলেই।

চাই ভেতর হতে জয়, অথবা বাহির থেকে এক মহান্ মৃত্যু।

নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ।

বীরভাবের কথা

[লেখক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

খৃষ্টের মুখ লইতেও একথাটি আমরা শুনিতে পাই—I came not to send peace, but a sword—তিনি শান্তিস্থাপনের জন্য আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন অসি হাতে যুদ্ধের জন্য। শুধু কথায় নয় কার্য্যতঃ ও এক সময়ে কশাঘাতে তিনি যেরুসালেমের বণিকদিগকে তাহাদের পণ্যশালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। তবুও খৃষ্টের ধর্ম্ম শক্তিধর্ম্ম ছিল না, তাহা ছিল অতিমাত্রই প্রেমের ধর্ম্ম। আবার বুদ্ধ যাঁহাকে আমরা জানি করুণারই অবতার বলিয়া, যিনি বিশ্বের দুঃখে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে ততখানি কান্তস্বভাব ছিলেন না, যতখানি ছিলেন শক্তির বিভূতি—শুধু তাহাই নয়, শাক্যসিংহের মধ্যে যে শক্তি খেলিয়াছে তাহা শান্ত রসাস্পদ বলিয়া মনে হয় না, তাহার প্রতিষ্ঠা তাহার প্রাণ বীরভাব, এমন কি একটা রুদ্রভাবেরই মধ্যে। তাঁহার সাধন-প্রণালী, তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন এক তপ্ত তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যখন বোধিদ্রুমতলে প্রায়োপবেশনে বসিলেন, যখন তাঁহার অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল, "এই আসন গ্রহণ করিলাম, শরীর যায় আর থাক সিদ্ধি ব্যতিরেকে এখান হইতে উঠিব না"—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—তখনই পাই বুদ্ধের প্রাণের ধর্ম্মের ইঙ্গিত। পুরাতন বৈদিকধর্ম্মকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন; কোন ভগবান, কোন দেবতা, কোন কিছু সত্তার উপর ভর করিয়া তিনি তাঁহার সাধনাকে দাঁড়াইতে দেন নাই—তাঁহার ধর্ম্ম নিরালয়, এক উগ্র তপঃ-শক্তির বলে ক্ষণিকবেদনাসমষ্টি এই যে সৃষ্টি তাহাকে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাপিত হওয়া, শূন্যে মিলিয়া যাওয়াই নিঃশ্রেয়স।

মানুষ কি বলে, কি ভাবে, কি চায়, কি করে, সেই বস্তুর মধ্যে প্রকৃত মানুষটিকে ঠিক ততখানি পাই না, যতখানি পাই সেই বলার, সেই ভাবার সেই চাওয়ায়, সেই করার ভঙ্গিমার মধ্যে। অন্তরাত্মার যে মূলভাব, যে বিশিষ্ট আবেগটী তাহা অঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে স্থূল উপকরণাদির গঠনের চলনের ভঙ্গিমারই মধ্যে—মানুষকে চিনিতে হইলে, পূর্ণরূপে চিনি এই জিনিষটির সহায়ে। কারণ আর সকল জিনিষ মানুষ সহজেই আহরণ করিতে পারে, বাহির হইতে অন্যের নিকট হইতে জ্ঞানতঃ হউক অজ্ঞানতঃ হউক ধার করিয়া লইতে পারে—আর সব জিনিষ সম্বন্ধে মানুষ ভাণ করিতে পারে, আপনাকে লুকাইতে পারে কিন্তু ভঙ্গীর মধ্যে সে চিরদিনই আসিয়া ধরা পড়ে। তাই ফরাসী মনীষী বুফন (Buffon) বলিয়াছেন—Le style c'est l'homme—রচনার যে ভঙ্গী সেখানেই রহিয়াছে সমগ্র মানুষটি। জগৎকে সে কোন দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহার জীবনের শাস্ত্র কি তন্ত্র কি সমস্তই প্রতিফলিত এই style এর মধ্যে। এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রাণের ধর্ম্ম; এখানে যাহা নাই সে সব হইতেছে তাহার বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বুদ্ধির ধর্ম্ম আর প্রাণের ধর্ম্ম—মানুষের আছে এই দুই ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাদের একটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ আর একটী আরোপ মাত্র, অন্যূনপক্ষে তাহার

সাধ্য বস্তু। একটী কল্পনার রচনা আর একটী নৈসর্গিক সৃষ্টি, একটীকে ধরিতে প্রয়াস করিতে হয়, আর একটী অযত্ন সুলভ, আপনিই আসিয়া ধরা দেয়। মানুষের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার মূল্যটী নিরূপণ করিতে হইলে এই প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে যথাযথ মানদণ্ড। বুদ্ধির ধর্ম্মটী যতখানি প্রাণের সহিত একীভূত হইয়াছে ততখানিই সে ধর্ম্ম জাগ্রত, জীবন্ত, কর্ম্মকুশল। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম্মের অর্থ এই প্রাণের ধর্ম্ম। প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে স্বধর্ম্ম, বুদ্ধির ধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মেরই একটা সাজাত্য আছে।

হইতে পারে প্রাণের ধর্ম্মটী অপেক্ষা বুদ্ধির ধর্ম্মটিই উচ্চতর মহত্তর। বুদ্ধির ধর্ম্ম দেখাইতেছে আমার আদর্শকে, আমি কি হইতে চাহিতেছি। আমি কি হইতে চাই, আমার আকাঙ্ক্ষা কি তাহার একটা মূল্য আছে, বিশেষ মূল্যই আছে—কিন্তু আশার কল্পনার যে মর্য্যাদা আমার নিভৃত ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে তাহা যতই বৃহৎ হউক না কেন, যতক্ষণ সে সব আমার প্রাণে সজীব হইয়া উঠে নাই ততক্ষণ সত্য হইয়াও উঠে নাই, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মার সৃষ্টি তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, বিশ্বের সহিত আমার যে প্রকৃত সংযোগ তাহা সে সকলের মধ্য দিয়া নহে, তাহার আমার প্রাণের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে সত্য তাহারই মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া আমি আমার যে একটা ধর্ম্ম খাড়া করি, জগৎ রহস্য সম্বন্ধে যে শাস্ত্র রচনা করি তাহা যে আবার আমার প্রাণের ধর্ম্ম প্রাণের তত্ত্ব হইতে উচ্চতর হইবে এমন কোন কথা নাই। অনেক সময়ে এমনও দেখিতে পাই প্রাণেরই মধ্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে একটা সমুচ্চের উপলব্ধি, আর বিচার বুদ্ধিই তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বিকৃত করিয়া দিয়াছে। প্রাণের যে সহজাত দৃষ্টি দিয়া জগৎ দেখিয়াছি, তাহাই সত্যতর, তাহাই উদার মহৎ বুদ্ধির কারুকার্য্যই তাহাকে মলিন বিরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রায়ই দেখি কবি তাঁহার কাব্যে যখন আপনার প্রাণটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তখনই তিনি পাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন খাঁটি জিনিষটি আর সেই কবিই যখন আপনাকে সমালোচনা করিতে বসিয়া গিয়াছেন কাব্যরচনা সম্বন্ধে শাস্ত্ররচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তখনি তিনি সত্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

বুদ্ধির ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বদাই তাই মিশিয়া থাকে কেমন একটা মিথ্যাচারের

অবাস্তবতার আভাস। সেখানে পাইনা সত্য ধর্ম্মের অটুট অব্যর্থতা অকুণ্ঠিত ঋজুতা। কথায় বস্তুতে সেখানে প্রাণধর্ম্মের যতখানি পরিত্যাগ করি না কেন, কথার ভঙ্গিমায় বস্তুর গঠনে সেটুকু কোন না কোন প্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিবেই। এমনও হয় যে যে-বস্তুটি প্রাণে নাই ঠিক সেই বস্তুটাই বুদ্ধি অতিমাত্র আঁকড়িয়া ধরে। স্বভাবের এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাণের তন্ত্রীতে সহসা একটা ভিন্ন সুর বাজিয়া উঠে। কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে আমরা অনুভব করিব সে সুর কেমন তাল কাটিয়া চলিয়াছে তাহাতে রহিয়াছে একটা বৃথা আরম্বর নতুবা তাহা হইতেছে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষ বুদ্ধির ধর্ম্ম দিয়া যাহাই ধরিতে চাহে না কেন, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে দেখিব তাহার ভাবে ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতে প্রাণেরই ধর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িতেছে, প্রাণের ধর্ম্ম অজ্ঞাতসারে কেমন তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ যাহা হইতে চায় তাহা অপেক্ষাও বলীয়ান হইতেছে মানুষ যাহা হইতেছে।

(২)

প্রত্যেক মানুষই এক একটি ভাবের বিগ্রহ। এক একটি মূলভাব যাহা তাহার প্রাণে তাহার ধাতুতে তাহার রক্তের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর সকল ভাব ইহাকেই অনুসরণ করিতেছে, ইহারই ছায়ায় গড়িয়া উঠিতেছে। বীরভাব, তপঃশক্তি, ক্ষত্তিতেজ এইরূপ যাহার প্রাণের ধর্ম্ম তাহার সকল কথাই ইহারই ব্যঞ্জনা লিপ্ত রহিয়াছে। বিপরীত কথা বলিলেও সেখানে পাইব এই ভাবেরই একটা ইঙ্গিত। আর যে মানুষের মুল প্রকৃতিতে এটি নাই যেখানে কোমলতারই আধিক্য সেখানে সকল বীরত্ব সকল দর্পের মধ্যেও পাইব এই কোমল ভাবই। শেলী ছিলেন স্বাধীনতার নবী, অত্যাচারের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। বিপ্লবকেও আহ্বান করিতে তাঁহার কিছু ইতস্ততা ছিল না। তবুও শেলী নারী-সুলভ মাধুর্য্য ও কোমলতারই প্রতিমূর্ত্ত। বীরত্বের মহিমা তাঁহার বিশেষরূপে জানা থাকিলেপ তাঁহার অধিগত জিনিষটি ছিল কমনীয়তা Helles অথবা Revlt of Islamএর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে শেলী —প্রকৃত শেলী নাই। প্রকৃত শেলী হইতেছেন তিনি যিনি পান (Pan) দেবতার স্তুতি করিয়াছেন, যিনি স্কাইলার্কের বন্দনা করিয়াছেন, যিনি গাহিয়াছেন প্রেমের তত্ত্ব (Love's philosophy) শেলী যখন বলিতেছেন—

Arise arise arise
There is blood on the earth that denies ye bread !

তখন সেখানে তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মাটি তিনি ধরিয়া দেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বলিতেছেন—

Like a cloud big with a May shower
My soul weeps healing rain
In thee, thou withered flower—

তখন তাঁহার প্রাণের সমস্ত নিগূঢ়তম রহস্যটিই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে আমরা বোধ করি। শেলীর সহিত তুলনা করুন বায়রণ। বায়রণও ছিলেন স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের উপাসক—আর সেই জন্যই উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু দুইজনের মধ্যে কি প্রভেদ? বায়রণ ছিলেন শক্তির বীর্য্যের বরপুত্র—তাঁহার কথার ভঙ্গিমায় কি এক তপঃশক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তিনি যখন বলিতেছেন—

The Assyrian came down like a wolf on the fold—

অথবা—

Jehov's vessels hold
The godless heathen's wine !

তখন যে সুর আমাদের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হয় তাহার তুলনা শেলীতে কিছু নাই, তখনই আমাদের সম্যক বোধগম্য হয় প্রকৃত বীরভাব জিনিষটি কি। এই সঙ্গে আর একজন স্বাধীনতার মুক্তির উপাসকের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি শক্তিকে বীরত্বকে তাঁহার ধর্ম্ম তন্ত্র হইতে বর্জ্জিত করেন নাই। তিনি শেলীর মত অতিমাত্র নারীপ্রকৃতি ছিলেন না, তাঁহার স্বভাবে পুরুষোচিত একটা সামর্থ্য ধৈর্য্য স্থৈর্য্যের ইঙ্গিত পাই। তবু কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। আমরা বলিতেছি মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা। যে Wordsworthএর মুখ হইতে আমরা শুনি বাহির হইয়াছি।

—Liberty shall soon, indignat raise
Red on the hills his beacon's comet blaze

—যিনি ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে প্রথমে লিখিয়াছিলেন মুক্তি, তিনিই পরে সে বিপ্লবের ঘোর বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত আর সহানুভূতি করিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের তালে আর তরঙ্গায়িত হইতে চাহিল না। বস্তুতঃ বায়রণের মত ওয়াড্সওয়ার্থের চণ্ড ক্ষাত্র প্রকৃতি ছিল না। তাঁহার মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাহ্মণ্যভাব।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩২৯।

মহাত্মাজী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সম্বাদ যে কি সে কেবল ভারতবাসীই জানে! তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নর-নারী পথে-পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ-কোটী সভা সমিতিতে হৃদয়ের গভীর ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না —যেন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল আজও সমস্তই ঠিক তেম্‌নি আছে, কোনখানে একটি তিল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয় নাই—এম্‌নি ভাবে আসমুদ্র হিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল? এতবড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল? নীচাশয় এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা কাটা-কাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত কাহারও নাই! মনে হয় যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।

যাইবার পূর্ব্বাহ্ণে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্য কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ-সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। এই কণ্ঠরোধ, এই নিঃশব্দ সংযম, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কতবড় দুঃসাধ্য

এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন যেদিন তিনি বিপন্ন দরিদ্র উপদ্রুত ও বঞ্চিত প্রজার পরম দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অর্থহীন, নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন সে দিনও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কত দূরে উৎক্ষিপ্ত হইবে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোন আশঙ্কা কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু, একবার যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব সম্বন্ধে শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আদেশ তাঁহার প্রত্যাহার করেন নাই। তার পর অকস্মাৎ একদিন চৌরি চৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন এ কথা সমস্ত জগতের কাছে অকপট ও মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হইল না। নিজের ভুল ও ত্রুটি বারম্বার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত হইতে সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্য্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন I have lost all fear of men জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এ দেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগ ও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয়হীনতার পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—এ কথা লোকে এক প্রকার ভুলিয়াই ছিল—যাবার পূর্ব্বে দেশের কাছে এই

পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া যাইতে হইল যে সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, যশঃ এমন কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পারা যায় না। কিন্তু এতবড় শান্তশক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা ধর্ম্মহীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুকাল হইতে এই সম্ভাবনা জনশ্রুতিতে ভাসিতেছিল, অতএব, ইহা আকস্মিকও নয়, আশ্চর্য্যও নয়। কারাদণ্ড অনিবার্য্য। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন কিছু নাই, আর্ত্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে লইল। দেশের মঙ্গলেই রাজশ্রীর মঙ্গল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ শাসন তন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এ দেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থেই রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কি না, ইহা চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে হইবে। আত্ম বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাবরোধের অধিকার অর্জ্জন করিয়া।

হয় ত ভালই হইয়াছে শাসন যন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা যে তিনি বার বার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয় —তাঁহার অবর্ত্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয় ত আজ সর্ব্ব সাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল তাহারা নিতান্তই মানুষ, কিন্তু মনে হয় অসামান্যতার পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

আরও একটা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন

দেশ যখন স্বাধীন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব জটিল হয় না, স্বদেশ প্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সে দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয় ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে তখন ঐ ঢিলাঢালা কর্ত্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দ্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয় কাজে, চালাকির মারপ্যাঁচে নয়, সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়, সকল চিন্তা সকল উদ্বেগ সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। ইহা অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোন মতে চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে গিয়াই আজ শত সহস্র ভারতবাসী রাজ কারাগারে। এবং এই জন্যই ইহাকে স্বরাজ আশ্রম নাম দিয়া ও তাঁহারা আনন্দে রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।

প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিগ্রহ এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে সে শুধু জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু রাজায় প্রজায় এই সংঘর্ষ প্রজ্বলিত করিবার যিনি সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু, এই বিরোধের মূল তথ্যটা আবার একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসই সকল সদ্ভাব, সকল বন্ধন, সকল কল্যাণ পলে পলে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিলেন এই, প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে,না এই নয় তোমার মিথ্যা কথা; রাজশক্তি কহিতেছেন, তোমাকে এই দিব এতদিনে দিব, প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে কোন দিন কিছু দিবে না,—নিছক বঞ্চনা করিতেছ।

"কে বলিল?"

"কে বলিল! আমার সমস্ত অস্থি মজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি আমার আত্মা, আমার ধর্ম্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পেটের সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি গুলা পর্য্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথাই ক্রমাগত বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে? চিরদিন তুমি শুনিবার ভাণ করিয়াছ কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরোনো অভিনয় আর একবার নূতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জগতের কাছে আমার লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে

নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।"

ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব সেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন এই বাঙলা দেশেরই একজন বিশ্ব বিখ্যাত বাঙ্গালী তাঁহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগা গোড়া ভাল ভাল ফাঁকা কথার বোঝার্য় ভরা চিঠিখানির ফাঁকিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই, এবং বোধ করি মনেও থাকে না। কিন্তু এপক্ষের মোট বক্তব্যটা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইনি বার বার করিয়া, এবং বিশদ করিয়া ওই বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্কটাই চার পাতা চিঠি ভরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এত বড় নূতন তত্ব কথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিদেশী সাহেবের আর কোথাও শুনিবার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ আমার বিশ্বাস সাহেবের বয়স অল্প হলেও এ তত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথমও জানিয়া জান নাই। কিন্তু জানা এক এবং তাহাকে মানা আর। তাই সাহেবকে কেবল এমন সকল কথা এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে কিন্তু অর্থ হয় না।

কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য? জগতে কোথাও কি ইহার ব্যতিক্রম নাই। গভরমেণ্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু শুধু কেবল এই জন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না এবং এই যুক্তিবলেই দেশের সর্ব্বপ্রকার রাজ-কার্য্যের সহিত অসহযোগ করিয়া বসিয়া থাকিব? গভরমেণ্ট ইহার কি কি কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, দিলেও হয়ত ওই মণ্টেগু সাহেবের মতই দেন যাহার মধ্যে বিস্তর ভাল কথা থাকে কিন্তু মানে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অফিসিয়াল বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন, তোমাদের এই সকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।

আমরা রাগ করিয়া জবাব দিই, ও আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও একতরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করিলে আমরাই বা করিব কি করিয়া?

অপর পক্ষ হইতে যদি পাল্টা জবাব আসিত, ও বস্তুটা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একতরফা হওয়া অসম্ভবও নয় অস্বাভাবিকও নয়। তাহা হইলে কেবলমাত্র

গলার জোরেই জয়ী হওয়া যাইত না। এবং প্রতিপক্ষ সাধারণ একটা উদাহরণের মত যদি কহিতেন, পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি যখন অস্ত্র চিকিৎসায় চোখ বুজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে তখন বিশ্বাস বস্তুটা একতরফাই থাকে। পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ জামিন ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, তাঁহার সাধু ও সদিচ্ছাই একমাত্র জামিন এবং সে তাঁহার নিছক নিজেরই হাতে। পরকে তাহা দেওয়া যায় না। রোগীকে বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।

এ পক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর হইতে পারে, ওটা উদাহরণেই চলে বাস্তবে চলে না। কারণ অসঙ্কোচে আত্ম-সমর্পন করিবারও জামিন আছে কিন্তু তাহা ঢের বড়, এবং তাহা গ্রহণ করেন চিকিৎসকের হৃদয়ে বসিয়া ভগবান নিজে। তাঁর আদায়ের দিন যখন আসে তখন না চলে ফাঁকি না চলে তর্ক। তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজ-শক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারা-মারি কাটা-কাটি, অস্ত্র-শস্ত্র বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবের সকল সুখ দুঃখ,সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্মের আধার তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক একদিন ইহাকে নির্ম্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্ত্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই এই ধর্ম্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা-বন্দুক-বারুদ কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে এই পরম সত্যকে তিনি,সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা ব্রতকে মাত্র ক্ষণেকের উপায় বলিয়া নয়, চির জীবনের একমাত্র

ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেম। এবং এই জন্যই তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে রাজনীতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দিনের পর দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিপক্ষ উপহাস করিয়াছে, স্বপক্ষ অবিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন কিন্তু মানুষ ইংরাজদের কোনদিন কোনদিন আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে!

কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—"I would decline to gain India's Freedom at the cost of non violence, meaning that India will never gain her Freedom without non —violence" তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে ' মহাত্মাজীর লক্ষ্য—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ এই লক্ষ্যের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য নহে" তখন তিনিও এই শিখার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড় সত্যবস্তু এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহ ও যে কত বড় স্বরাজসাধনা তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ। এবং এই চাওয়ার মধ্যেই মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার এবং সর্ব্বো-উত্তম লক্ষের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের স্বার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজও সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন মানবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা বা স্বরাজকামী যখন তিনি ইংরাজ রাজত্বে সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন

তখন তাঁহাকে বিস্তর কটূকথা শুনিতে হইয়াছিল। বহু কটূক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে ইংরাজ রাজত্বের সহিত আমাদের চির দিনের অবিচ্ছিন্নবন্ধন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরুপদ্রব শান্তির জন্যই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এত বড় পাপী তখন যেমন করিয়া হৌক ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম। ইংরাজ নিরুপদ্রব পথে রাজ্য স্থাপন করে নাই, এবং রক্ত পাতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য? কিন্তু মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন এ যুক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্ত বড় ভুল প্রচ্ছন্ন লইয়া আছে। বস্তুতঃ, এ কথা কিছুতেই সত্য নয় জগতে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে অধর্ম্মের পথে একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে আজ তাহাকে ধ্বংস করাই ন্যায় যেমন করিয়া হোক তাহাকে বিদূরিত করাই আজ ধর্ম্ম! যে ইংরাজ রাজ্যকে একদিন প্রতিহত করাই ছিল দেশের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম! সেদিন তাহাকে ঠেকাইতে পারি নাই বলিয়া আজ যে-কোন-পথে তাহাকে বিনাশ করাই দেশের একমাত্র শ্রেয়ঃ এ কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্ম্মের পথেই জন্ম লাভ করে অতএব ইহাকে বধ করিয়াই ধর্ম্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তাহা সত্য নয়।

বন্দী বীর

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

(দ্বীপান্তরিত দেশ-নেতা)

সময়—প্রভাত।

ওরে বন্দী করিল কে!
গর্ব্বী আমার মত্ত পরাণে বন্ধন দিল রে!
বদ্ধ করেছে লৌহকারায়—তারি পাশে দৃঢ় ভীম
প্রাচীর-পরিখা ঘেরিয়া দাঁড়ায়—প্রাণ করে ঝিম্‌ঝিম্‌,
আকাশ নেহারি নীল-অর্ণব নির্ব্বাক দয়াহীন
প্রভাত-অরুণ-করুণ ছটায় তেমনি ত দিশি লীন।

ঐ শোনা যায় সিন্ধু গর্জ্জে আছড়ি পড়িছে জল
লৌহকারায় কম্পন লাগে, প্রাণ করে টলমল,
ভাঙি দিব আজ লৌহকারায় চূর্ণি পরিখা বেড়
সিন্ধুর কল কল্লোল পাশে দাঁড়াইয়ে উদ্বেল
উত্তাল চল চঞ্চল ক্ষ্যাপা প্রবল করিব প্রাণ,
উচ্চ উর্ম্মি দলিয়া চরণে করে যাব অভিযান
স্বদেশে আমার স্বর্গে আমার—দৃঢ়তর বলীয়ান
দৃঢ়তর বীর কর্ম্ম অটল ; করে' লব গরীয়ান
অবনত ম্লান দীন দেশভূমি, শক্তমুষ্টি-বল
শত্রুর মাথে পরখ্ করিব ; অন্যায় কলা-ছল
চূর্ণিয়া দেশ করিব মুক্ত ভাস্বর দিবা প্রায়,
আয় রে সিন্ধু-কলকল্লোল আয় আয় বুকে আয়।

সময়—মধ্যাহ্ন।

দুপুরে সূর্য্য বিকট বীর্য্য ছড়ায় সকল দিক
সিন্ধুগর্জ্জে ভীম ভীমতর দাপটি ঝাপটি ;—ধিক!
ধিক্ ধিক্ মোরে আলস-বিলাসী কাজহীন অক্ষম
নিশ্চল বসি নির্জীব হেথা, হোথা পাপ নিরমম
শত্রু সাধিছে, আর্ত্ত কাঁদিছে কে মুছাবে আঁখি-জল
কে বলিবে—"ভাই, কোন ভয় নাই, নহি নহি দুর্ব্বল,
এই আমি আছি চলে এস কাজী বর্ম্ম কৃপাণ কই
দুর্জ্জয় জয় বাসনা বক্ষে দীন নহি, ক্ষীণ নই।"
কল্প নয়নে দেখি—অন্যায়ী তুলি উদ্ধত হাত
নির্ব্বাক দেশসেবীর মাথায় করিছে অস্ত্রাঘাত,
ভূমে ঝরে পড়ে লক্ষ ধারায় জীবের শোণিত স্রোত—
সে স্রোতের টীকা ললাটে পরিয়ে দৃপ্ত দুর্নিরোধ
কে যেন জাগিল গর্জ্জি জাগাল লক্ষ ত্রস্ত প্রাণ,
নৃত্যে মাতিয়া মৃত্যু বরিছে, কাটি করে খান খান
অত্যাচারীর দম্ভ পূরিত গর্ব্বিত শত শির,
নির্দ্দোষ শত ভ্রাতারে বাঁচায়, বীর বটে সে যে বীর।

ঐ ঐ পথে চলে যে দুখিনী ক্ষীণ শিশু বুকে রয়
শত্রুর গোলা তাহারে গ্রাসিতে ছুটে আসে দুর্জ্জয়—
এই এই আমি, আমি লব গোলা বক্ষ পাতিয়া আজ
ও দীনা নারীরে রক্ষা করিতে হাসিয়া বরিব বাজ।
যাই যাই!—একি চরণে টানে যে লৌহের শৃঙ্খল,
কারার দুয়ারে হাত নাহি যায়, একি জঞ্জাল বল্!
ছিঁড়িব বলয় মুক্ত চরণে দুয়ারে করিব ঘাত
সাতারি' সিন্ধু ভেদিয়া চলিব নিমেষে হতে না রাত,
বীরের মতন ছুটিয়া যাইব আর্ত্ত-ভ্রাতারি মাঝ,
দেখিয়া সঘনে গাবে উল্লাস, বলিবে যে—"সাজ সাজ।"
আমি ফুকারিয়া আকাশ ফাঁড়িয়া বলিবরে—"জয় জয়,
জয় জয় জয়ী হে দেশতনয়, জন্মভূমির জয়।"
শীত কুঞ্চিত বৃক্ষপত্র প্রভাতে তুলে সে শির—
তেমনি গর্ব্বে উঠিবে জাগিয়া ম্লান অনুচর বীর;
মৃত্যু দলিয়া নৃত্য করিব—শত্রুর অবসান;
নাহিক গোপন,—অরুণ-কিরণ সমান দীপ্তিমান
আঁধার বিতাড়ি' নির্ম্মল পূত করিব জননী দেশ,
না রবে ভ্রূকুটি পীড়নের নীতি, নাহি নাহি রবে ক্লেশ।
প্রখর রৌদ্র পড়িয়াছে ঐ কারার প্রাচীর গায়
তাহারি ওপাশে সিন্ধু উছসে, বলে যেন—আয় আয়,
যাই যাই আমি গর্জ্জন ডাকে, নর্ত্তন দেয় দোল,
হে পিতা সিন্ধু, রুদ্র দীক্ষা দাও দাও মোরে কোল,
পিতার সমান লালিয়া পালিয়া দাও মোরে বল দাও,
উর্ম্মি বাহুতে লুফিয়া লুফিয়া লয়ে যাও লয়ে যাও,
দুর্দ্দম দাও শক্তি প্রচুর উদ্দাম-গতিমান,
তুমি যে সিন্ধু মূক ধরণীর জাগ্রত চল প্রাণ।
অসহ রৌদ্র, তাহাতে রুদ্র সিন্ধুর গরজন,
আমি যে বদ্ধ!—দুঃসহ ক্লেশ! ভাঙ ভাঙ বন্ধন।
সূর্য্য প্রখর তূর্য্য বাজাও হে জীবন-সুধা-রস,
সিন্ধু মহান মাতাল-পরাণ, কর মোরে নিরলস।

সময়—সন্ধ্যা।

দিবা শেষ হয় আজি হল ছয় দিবস হেথায় আমি—
রুদ্ধ পরাণ বক্ষ-খাঁচায় আছড়িছে দিবা যামি;
এই যে আজি কে কারার উপরে একটি দিবস মরে
কর্ম্মবিহীন অলস নীরব,—কে জানে রে দেশ-ঘরে
এই দিবসের প্রতি নিমেষেই উঠেছে আর্ত্তস্বর—
অত্যাচারীর গোপন অস্ত্র পাড়িয়াছে ভূমি'পর
নির্দ্দোষ মম ভ্রাতাভগিনীরে অন্যায় রোধী ধীর,
হায়রে অলস বাহুযুগ মোর ভাঙ কারা চৌচির।
হয়ত একটি নির্ভীক ভ্রাতা আজিকে সারাটি দিন
রক্ষিতে শত নির্দ্দোষ প্রাণ যুঝিয়াছে শ্রমহীন,
শেষে সে পড়েছে বৃক্ষ সমান বৈশাখ ঝটিকায়,
কে তাহার স্থানে দাঁড়াতে আছে রে,—ধিক্ ধিক্ হায় হায়!
মনে পড়ে আজ সন্ধ্যা এমনি ঘিরে ঘিরে আসে দিক—
দশ জন মোরা সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়ে অনিমিখ
ক্ষুব্ধ পিষ্ট ক্লিষ্ট দেশের মুক্ত করিতে দুখ
করেছিনু পণ,—আশা ও হর্ষ ভরে' ভরে' তুলে বুক
সে দিনের নিশা করে' দিয়েছিল জননীর শুভাশিস্—
পূত মঙ্গল পূজার নিমেষ; দেখেছিনু দিশে দিশ
পুণ্য আলোক হৃদয়াভিরাম। সেই দিন হতে সেই
দলে দলে বীর মন্ত্রে যুবক আসিল, শঙ্কা নেই।
কারার শঙ্কা মরার শঙ্কা কেটে গেল, নির্ভীক
লক্ষ তনয় দুঃখী মাতার জয়গানে ভরে' দিক
যাত্রা করিল দৃপ্ত সতেজ পরিয়া বর্ম্ম-সাজ;
আজি কি সকলি বিফল ভাগ্য নিহত, বিশ্বরাজ?
কে বলে বিফল কে বলে নিহত?—আজো রই আমি বেঁচে
আজো বাহু মোর শক্ত সুদৃঢ়, লব কি মরণ যেচে?
আকাশের পানে দেখিরে যাচিয়া নেমে গেছে কূল পানে,
ঐ ঐ দিকে স্বদেশ আমার ঐখানে ঐখানে,

ঐখানে সেথা দেখেছি সে দিন ঝাপ্‌সা ধোয়ায় ঢাকা
স্বদেশ-স্বর্গ জাগিছে আমার স্নেহ-প্রেম দিয়ে মাখা।
ব্যথিত পীড়িত ক্রন্দননত জননী স্বদেশ মোর
বেদনা তোমার সিন্ধু বাতাসে ছুটিয়া লাগায় ঘোর।
ঐ ধোঁয়া মাঝে সুদূর বেলায় শান্ত আকাশ-তলে
স্বদেশে আমার কি বা সে বেদনা অবিরাম ছলছলে!
আর্ত্তের উঠে ক্রন্দন-রোল দুঃখীর দুখতাপ
নির্দ্দোষ ক্ষত হৃদয় হইতে কত না সে পরিতাপ;
কত অন্যায় কত অবিচার অত্যাচারের ঘায়
বিহ্বল দেশতনয় কাতরে অন্তরে মোরে চায়।
প্রাণ কাতরায় যায় দিবা যায় যষ্ঠ দিবস শেষ,
প্রভাতের আশা নিভে যায় যে রে, ভাঙি কিসে এই ক্লেশ?

সময়—রাত্রি।

নিদ্রা?—ঘুমাতে করে না লজ্জা?—কি শান্তি নিয়ে শু'স্
অন্তর জ্বালা কিসে জুড়াইল, দেশত্যাগী কাপুরুষ!
রাত্রি শীতল ঢালিছে উতল শান্তি,—পাষাণ চাপ
এ যে মোর বুকে বাজিছে বিষম নির্দ্দয় অভিশাপ।
মুগ্ধ সিন্ধু প্রহরী ঘুমায়, স্তব্ধ সকল রব,
মোর অন্তরে জ্বলিছে আগুন, করিতেছে কলরব
বিফল আহত শতেক বাসনা দুর্দ্দম মনোবেগ
গর্জ্জন রত বজ্রগর্ভ যেন বৈশাখ মেঘ
ফাঁড়ি মৌনতা ছাড়ি হুঙ্কার ভেঙে দিতে চায় ঘুম
শান্তি দাত্রী নিথর রাত্রি মরুক্ সে নিঝঝুম।
শান্তি কে চায়, কে চায় নিদ্রা, রাত্রি কে চায় বল্
চাহি চঞ্চল চপল দিবস, কর্ম্মমুখর পল,
উচ্ছ্বাসময় সিন্ধু আবার, উল্লাসময় তান,
শান্তিঘাতিনী সর্ব্বনাশের কৃপাণনিষ্ঠ প্রাণ।
মৌনতা টুটি উঠুক্ রে ফুটি দুর্দ্দম মম আশ,
উতল করুক্ নিথর রাত্রি দুরাশারি উল্লাস।

শ্রবণে যে আসে মর্ম্মপীড়িত বিধবার ব্যথা-স্বর,
পুত্রবিহীন জনক জননী-ক্রন্দনে পরিপূর
স্বদেশ আমার, জাগিছে বেদন ঝরিতেছে আঁখি-নীর,
আমি যে ভর্ত্তা আমি যে পুত্র শত দুখী-দুখিনীর।
পাষাণ রাত্রি মৃত্যু-ধাত্রী, এত ব্যথা উচ্ছল
বক্ষে পুষিয়া নির্ব্বাক রহ ব্যথাহীন অচপল;
ও বুকে তোমার বাজে না বেদনা? মর্ম্মের শোক-বাণ
তোমারে বিঁধিয়া অস্থির করি তুলিবে না গতিমান?
দেশের লক্ষ দুখীর বেদনা আমার মরম-শোক
ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া টুটিয়া তোমারে উঠুক আকাশ-লোক;
কোন্ কোণে আছে কোথায় গোপনে বলি যারে ঈশ্বর
বাক্‌হীন মূক অন্যায়-পোষী;—মঙ্গল ভাস্বর?—
যদি কোথা থাকে যদি বা সে থাকে যদি কোনো নিরালায়
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া বসুক্ আমার দুঃসহ ব্যথা তায়—
সে নহে পুরুষ নহে ধার্ম্মিক অন্যায়-নিবারক,
নহে ব্যথাহারী পুণ্য বিকাশ পিষ্টের রক্ষক;
ভীরু কাপুরুষ হৃদয়বিহীন অক্ষম দুর্ব্বল
অত্যাচারীর গুপ্ত পোষক, নিতি ভীতি-চঞ্চল।
যদি সে ধর্ম্ম জলিয়া উঠুক্ পুণ্য-পাবক তার
অধর্ম্ম আর অন্যায় দহি' করে' দিক্ ছারখার।
ধরুক্ মূর্ত্তি করাল ভীষণ পাপনাশী শঙ্কর
তাথই তাথই নাচিয়া নাশুক্ অন্যায় ভূমি' পর।
আমি বিদ্রোহী দাপটি ঝাপটি শান্তি করিব শেষ,
হইব বিজয়ী জিনিয়া মৃত্যু নাই ঘুম সুখ-লেশ।
ঐ আছাড়িল সিন্ধু উর্ম্মি রাত্রির কাঁপে বুক,
কাঁপে বুক কাঁপে অন্তর মোর আছড়িছে সেথা দুখ।
লৌহকারায় লৌহ আঙুলে শাসিয়া বলিছে—"হায়,
বৃথা রে চপল তব আলোড়ন বৃথা নাচা দুরাশায়।
শোণিত শুষিয়া চুষিয়া মাংস পিষিয়া অস্থিচয়
বাসনা তোমার আশা উচ্ছ্বাস করে' দোব সবি লয়॥"

তার চেয়ে আজি রাত্রির বুকে মাগি চির অবসান
মাগিয়ে মৌন মৃত্যুর মাঝে হইতে মজ্জমান।
কিন্তু মরিতে বিষম বেদনা! নাহি রে মরিতে সাধ,
রাত্রির বুকে লুকাইয়া থাকি ঘটাই পরমাদ।
রাতির মৃত্যু নিবিড় কালিমা ভেদিয়া সূর্য্যবীর
যথা বাহিরায় শক্তি-পাবক দুর্জ্জয় অস্থির,
তেমনি বিষম ভীম দুর্দ্দম উন্মুখ মম প্রাণ,
এ প্রাণ লইয়া স্ফূর্ত্তি মাখিয়া করিব রে অভিযান।

অন্নপূর্ণা

[শ্রীসুনীতিদেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস গত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পরে যখন সেই মৃতদেহ লইয়া আকুলপ্রাণে মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মিত্রজা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "এস মা, আমার সঙ্গে এস।" তৎপর গৃহিণী ও অন্নপূর্ণাকে লইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় তাহার পুত্র ও পুত্রবধু ছিলেন। অন্নপূর্ণা কেমন যেন উদাস প্রাণে নূতন স্থান সকল দেখিতে দেখিতে বাসায় আসিয়া পৌছিলেন। গাড়ী হইতে নামিবার সময় অবগুণ্ঠনবতী তরুণীকে দেখিয়া বিপিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে? পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কন্যা।"

অন্নপূর্ণা আসিয়া রন্ধনগৃহের ভার লইলেন। মিত্র-গৃহিনীকে বলিলেন, "মা ব্রাহ্মণ রাখার প্রয়োজন নাই। আমিই রাঁধ্‌ব।"

বিপিনের স্ত্রী শৈলবালা অন্নপূর্ণার সমবয়সী। দেখিতে মন্দ নয়। তাঁহার স্বামী বিপিন শিক্ষিত, কিন্তু বড় সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি, নিজের চরিত্রও নির্ম্মল নহে। সন্দিহান হইয়া শৈলবালার প্রতি মাঝে মাঝে বড় অত্যাচার করিতেন। শৈল-বালা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রথমতঃ সে পরমাসুন্দরী,—

তাহার কাছে শৈলবালাকে কেহ সুন্দরী বলিবে না। দ্বিতীয়তঃ এ অনুপম রূপলাবণ্যবতী তাঁহার স্বামীর চক্ষে না পড়ে। অন্নপূর্ণার সহিত তিনি ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। যে তাহার বাড়ীর রাঁধুনী তাহার সঙ্গে—তিনি অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রী হইয়া সমবয়সীভাবে কথা কহিলে সম্মানহানির সম্ভাবনা। যাহা হউক, অন্নপূর্ণার সে জন্য কোন দুঃখ ছিল না। গৃহিণী তাহাকে ভালবাসিতেন, সেও তাঁহার খুব যত্ন করিত।

বিপিনের সাক্ষাতে অন্নপূর্ণা কখনও বাহির হইতেন না। সুতরাং তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যও বিপিনের চক্ষে পড়িত না। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ অন্নপূর্ণাকে একখানি গীতা দিয়াছিলেন। সে অবসর মত সেই গীতাখানি পাঠ করিত,—তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল ও শান্তির উপায় ছিল।

একদিন অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া চুলগুলি খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন অবস্থায় বিপিন তাহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, এমন অনুপম রূপ তিনি আর কোথাও দেখেন নাই!—দেখিয়াই তিনি মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিলেন। ইদানীং যথেষ্ট মদ খাইতেন,—তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তাই মদে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সে দিন রাত্রিতে বিপিন বাসাতেই রহিলেন,—ইদানীং তিনি প্রায়ই থাকিতেন না।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ-মণ্ডল নিবিড় মেঘে আছন্ন। বায়ু স্থির,—ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া সকলেই সকাল সকাল কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া নিজ নিজ গৃহে কপাট বন্ধ করিয়াছে। দ্বিতলগৃহ, উপরে পাঁচটা ঘর। একটীতে কর্ত্তা ও গৃহিণী থাকিতেন, একটা বিপিনের শয়ন-ঘর, মাঝে দুইটি ঘরে জিনিষ-পত্র-পুস্তকাদি, পাশের ঘরটায় অন্নপূর্ণা একাকী শয়ন করিত। অন্নপূর্ণা শয়ন করিতে যাইয়া দেখিল, কপাটের খিলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে কপাট ভেজাইয়া, উহাকে একটি ছোট বাক্স ঠেকা দিয়া রাখিল। তৎপরে ঘরের জানালা খুলিয়া প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

বাতাস জোরে বহিতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। পাশের ঘরে কথা কহিলেও অন্য ঘরে কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা নাই! তাই অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত হইয়া গাহিতেছিল—

কি যেন চাহে মন কি যেন চাহে,
জানি না ভাষা তার যে প্রকাশি তাহে;
কিসের আবেগে এ পরাণ আকুল,
কেমনে পা'ব যাহা জগতে অতুল!

দিন তো ক্রমে এল ফুরা'য়ে আমার,
এখনো কোথা যাহা জীবনের সার !
বিনা সে ধন যেন বাঁচি মরিয়ে,
যা'বে কি দিননাথ, এমনি করিয়ে !

যখন অন্নপূর্ণা আকুলপ্রাণে তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল, সেই সময় বিপিন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে সেই গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। সন্ধ্যার সময় গৃহের খিলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং গৃহে প্রবেশ করিবার কোন বাধা ছিল না। সেই ভীষণ ঝড় যখন রাশি রাশি গৃহ ভূমিসাৎ করিতেছিল, তেমনি সময় সে আস্তে আস্তে অন্নপূর্ণার গৃহের কপাট খুলিল। অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতেই সহসা অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল !

সেই নেশার ঘোরে কাণে বাজিতে লাগিল, "কি যেন চাহে মন কি যেন চাহে !" বাহিরে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন, ঝটিকার প্রচণ্ড আঘাতে, গৃহগুলি যেন কাঁপিতেছিল। তাহার মনের ভিতরও তেমনি প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতে লাগিল। সে তখন আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে কেবল এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল, "মন কি চাহে মা ?"

(৯)

প্রভাত হইয়াছে। প্রথমে মেঘের হাত এড়াইয়া সূর্য্যদেব যেন উঠিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন। বিপিন শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। সেখানে তখন জনপ্রাণী ছিল না। আকাশপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এই ত ঝড়-বৃষ্টির পরে আকাশের মেঘ কাটিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। আমার এই পাপ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে কি জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হইবে না ? এই ত সূর্য্যালোক উদ্ভাসিত জগৎ হাসিতেছে, আমার হৃদয় কি জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া শান্তি-কিরণে হাসিবে না ? "দিন ত এলো ফুরায়ে আমার, এখনো কোথা যাহা জীবনের সার",—এ জীবনের সার কি ? এতদিন ত ভোগেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছি। অথচ তাহাতে কি কখনও শান্তি পাইয়াছি ? কি একটা অভাব যেন সর্ব্বদাই অনুভূত হইয়াছে ! দিন ত ফুরাইয়ে আসিল, —কে আমাকে বলিয়া দিবে মা, "কিসের আবেগে এ পরাণ আকুল ?" যে স্ত্রীজাতিকে আমি জ্ঞানহীনা বলিয়া ঘৃণা করিতাম, আজ সেই স্ত্রীজাতি আমার

অন্ধত্ব ঘুচাইয়া, আমাকে দিব্য জ্যোতিঃ প্রদান করিলেন! যাঁহার কৃপায় আমি এ নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি,—পাষণ্ড আমি সেই জননীকে অবমাননা করিতে গিয়াছিলাম! ধিক্ আমাকে! তিনি নিশ্চয়ই জানেন, মন কি চাহে। কিন্তু যে নরক হৃদয়ে লইয়া সেই পবিত্র দেব-মন্দির কলঙ্কিত করিতে গিয়াছিলাম, কোন্ মুখে আবার সে গৃহের সম্মুখীন হইব? তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব,—এ জীবনের সার কি?"

এমন সময় রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল,—

"খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌রে পা'বি
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।"

সহসা বিপিন "জয় দীননাথ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশের মেঘের সঙ্গে আজ যেন তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। "যে ধন জগতে অতুল" প্রাণ-মন দিয়া খুঁজিলে তাহা হৃদয়ের মধ্যেই পাইবে!—এই আশায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। বাসা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে একটা বিস্তৃত প্রান্তর, তৎ-সন্নিকটে একটি বটবৃক্ষচ্ছায়ে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বিপিন পায়চারি করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির উদার দৃশ্য তাঁহার প্রাণে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় সুপ্ত ভাবকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। বিপিন কতদিন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন, আরতো কোন দিন এমন লাগে নাই?

বেলা প্রায় প্রহরাতীত। চাকর আসিয়া ডাকিল, "বাবু, মা ডাকিতেছেন।" বিপিনের চমক ভাঙ্গিল। "এই যাচ্ছি, তুমি যাও,"—বলিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিলেন।

বিপিনের বড় গরম বোধ হইতেছিল। ভাবিলেন, পুকুর হইতে স্নান করিয়া যাই। পূর্ব্বদিনের ঝড় বৃষ্টিতে ঘাটের অবস্থা বড় খারাপ হইয়াছিল। বিপিন যেমন নামিতে গিয়াছেন, অমনি হঠাৎ পা পিছলাইয়া গড়াইতে গড়াইতে শানের উপর পড়িয়া বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞান হইলে দেখিতে পাইলেন, তিনি একটি অপূর্ব্বদৃষ্ট নূতন গৃহে শয়ান রহিয়াছেন। সম্মুখে অপরিচিত একটি ভদ্রলোক, বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। বিপিনের জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া চাকরকে গরম দুধ্ আনিতে বলিলেন। দুধ্ আসিলে নিজের হাতে বিপিনকে খাওয়াইতে গেলেন। বিপিন বলিলেন, "আমি কোথায়?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আগে একটু সুস্থ হয়ে

।নন্‌, পরে সে কথা হ'বে।" দুধ পান করিয়া বিপিন কহিলেন, 'আপনি কে? আর ত কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না, অথচ পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এ স্থানে আমি নূতন আসিয়াছি। আমার নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।"

"ওঃ, আপনি এখানকার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্? আপনার নাম শুনিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে আপনি অচেনা লোককেও এমন আত্মায়ের মত যত্ন করেন।"

বিনোদ হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে ওরূপ অবস্থায় পতিত দেখিলে কি আপনি ফেলিয়া যাইতে পারিতেন। ইহাতে মানুষকে ধন্যবাদ দিবার কি আছে?"

বিপিন বাসায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনোদলাল তাঁহাকে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া নিজে সঙ্গে চলিলেন।

(১০)

বিপিনের সঙ্গে এই সূত্রে বিনোদের বেশ সদ্ভাব জন্মিল। একদিন বিপিনের মাতা বিনোদের বাসায় বেড়াইতে আসিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সুরমাকে তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুরমা যাইতে স্বীকৃত হইলেন, ও বিনোদকে বলিয়া পরদিন বিনোদের বাসায় বেড়াইতে গেলেন।

শৈলবালার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সুরমা ঘুরিয়া ঘরগুলি দেখিতেছিলেন। অন্নপূর্ণার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি পরমা সুন্দরী তরুণী জানালার কাছে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া যেন গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে!

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" শৈল বলিলেন, "আমাদের রাঁধুনী বামনী।" সুরমা কহিলেন, "বাঃ চমৎকার সুন্দরী কিন্তু। দেখিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।" শৈল সুরমাকে ডাকিলেন, "আসুন।" সুরমার যেন সেখান থেকে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। শৈল আবার ডাকিলেন, অগত্যা সুরমাকে আসিতে হইল। কিছু জল খাইবার আয়োজন করিয়া গৃহিণী ডাকিতেছিলেন। সুরমা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া, শৈলবালার সঙ্গে একটা নিভৃত কক্ষে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটীর বাড়ী কোথায় জানেন কি?"

শৈল। আমি বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, বাড়ী ঘর থাকিলে কি আর পথে পথে বেড়ায়?

সুর। ওঁকে আপনার কি রকম প্রকৃতির মনে হয়?

শৈল। জানি না, তবে সচ্চরিত্রা হইলে এই বয়সে গৃহের বাহির হইল কেন? ওর হাতে একটি বহু মূল্যবান্ আংটী আছে। আমি ত ইংরাজি জানি না, তাহাতে ইংরাজিতে কাহার নাম লেখা আছে। খুব বড় লোক ভিন্ন ওরূপ আংটী সাধারণের সম্ভবে না। উহার নিজস্ব হইলে উহা বিক্রয় করিয়াও ত কতদিন চালাইতে পারিত। উহার শ্বশুর কিম্বা বাপের একটা ভিটাও কি নাই? তাহাতেই মনে হয়, উহারি প্রণয়াস্পদ কেহ আংটী দিয়াছে, প্রণয়-চিহ্ন বলিয়া বিক্রয় করে নাই।

সুর। এ তো সব আন্দাজী কথা। কিন্তু আমার মনে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না,—আপনি কি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

শৈল চুপি চুপি সুরমার কর্ণে মুখ সংলগ্ন করিয়া কি একটা কথা বলিলেন, শুনিয়া সুরমা শিহরিয়া উঠিলেন।

বেলা শেষ। সূর্য্যদেবকে গমনোন্মুখ দেখিয়া সুরমা সেদিনকার মত বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনটা যেন বড়ই ভারাক্রান্ত বোধ হইতে লাগিল।

(১১)

বিনোদ অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "সুরমা!"

সুরমা রাঁধিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

বি। আমি যে আনন্দ রাখিবার জায়গা পাইতেছি না, তাই তোমাকে বিলাইতে আসিয়াছি।

সু। ব্যাপার কি তাই বল না?

বি। তোমার কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। আজ কথাপ্রসঙ্গে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমাদের পাচিকা ব্রাহ্মণী নাকি ভারী সুন্দরী? তোমরা তাহাকে কোথায় পাইলে? বিপিন কহিল, কাশীধামে এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কন্যাকে বাবার কাছে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণের পরিচয় জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাঁহার প্রকৃতি তোমার কেমন মনে হয়? বিপিন বলিল, আমার

মনে হয়, তিনি দেবী নহিলে আমার মত মহাপাপিষ্ঠের মতি ফিরিয়া যায়? আমি বলিলাম, তোমার কথার অর্থ তো আমি বুঝিলাম না।

বিপিন কহিল,—আমি তাঁহাকে মনে মনে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি, সুতরাং মা-ই বলিব। তিনি কোন দিন আমার সমক্ষে বাহির হন নাই, সুতরাং আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। একদিন, সেই ভীষণ ঝড়ের দিন, তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই পাষণ্ডের চক্ষে পড়িল। আজ আমার পাপের কাহিনী তোমাকে বলিয়া আমার হৃদয়ের ভার লঘু করিব। তাঁহাকে দেখিয়া তখন আমার মনে হইল, যেমন করিয়া হউক ইহাকে পাইতে হইবে-কিন্তু সে কথা এখন মুখে বলিলেও পাপ বলিয়া মনে হইতেছে।

সেই ভীষণ ঝড়ের সময়ে আস্তে আস্তে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—ইহাতে পলাইবার পথ নাই, রক্ষা করিবারও কেহ নাই, সুতরাং আমার পথ—থাক্। অকস্মাৎ কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আমার কাণে প্রবেশ করিয়া, এ দগ্ধ প্রাণে যেন অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে পাইলাম। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল, আমি অতি সন্তর্পণে সে ঘর হইতে আমার শয়ন গৃহাভিমুখে চলিলাম।

বিপিনের সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হইল, সে সব কথায় তোমার প্রয়োজন নাই। এইবার বিপিনের স্ত্রীর কথার সঙ্গে মিলিতেছে কি না? ঝড়ের দিন তো তিনি দেখিয়াছেন, বলিয়াছিলেন? আর সেই মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করায় যে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? তিনি তো কিছুই টের পান নাই। বিপিনের স্ত্রী যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু তাহাতে তো কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সে গানটা আমি লিখিয়া আনিয়াছি, তোমাকে দেখাইব।

সুরমা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বাস্তবিক দেবী মূর্ত্তি যেন! এমন সৌন্দর্য্য মানুষে এখন পর্য্যন্ত দেখি নাই।—দেখি, সে গানটি কি?"

বিনোদ দেখাইলেন। তৎপর বলিলেন, "শোন সুরমা, আমার কেন এত আনন্দ হইতেছে। তোমার কথা শুনিয়া অবধি আমার কেবলই মনে হইতেছিল,—এই যদি সতীশের স্ত্রী হয়! কিন্তু যেরূপ প্রমাণ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আর সে সম্বন্ধে খোঁজ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। এখন আমার মন অত্যন্ত অধীর হইতেছে। তাহাকে আর একদিন কোন ছলে আনিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি বাস্তবিকই সতীশের স্ত্রী অন্নপূর্ণা

হয়, তবে কত সুখের হইবে!—সুরমা, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দে অধীর হইতেছি। আমার প্রাণ-প্রতিম বন্ধু সতীশ একাকী,—আর আমি তোমার সঙ্গে কত সুখে দিন কাটাইতেছি, ভাবিলে আমার মন যেন কেমন করে! সে তো স্থির করিয়া বসিয়া আছে, দেশের এবং দশের কাজে জীবনটা কাটাইয়া দিবে। আর বিবাহ করিবে না,—ইহা তাহার স্থির সঙ্কল্প। যদি অন্নপূর্ণাকে আনিয়া তাহাকে দিতে পারিতাম, তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিতাম,—তবে আমার কত আনন্দ, কত সুখ হইত! যাই হোক্ সুরমা, আর দেরী করিয়া কাজ নাই। কালই তাহাদের নিমন্ত্রণ করি;—তুমি কি বল?"

সুরমাও অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, "আমি আপত্তি করিব নাকি?"

(১২)

অন্নপূর্ণা এবং বিপিনদের বাসার সকলে পরদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বিনোদের বাসার আসিয়াছেন।

সুরমা রন্ধনকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। ক্ষিপ্রহস্তে, সকল কাজ সারিতেছেন। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সুরমার বড় কষ্ট হইতেছে। তখন তিনিও সুরমার সাহায্যে প্রবৃত্তা হইলেন। যখন যাহা জোগাড়ের প্রয়োজন বুঝিতেছেন, তখনই তাহা করিতেছেন। সুরমা নিষেধ করিলেন না। সকলের আহারাদি শেষ হইলে শৈলবালা ও তাঁহার শ্বশ্রূর সঙ্গে সুরমার কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইল। তৎপরে বিপিনের মাতা বলিলেন, "তবে আজ আসি মা, বেলা গিয়াছে।"

সুরমা বলিলেন, "আমার শরীর কিছু অসুস্থ বোধ হইতেছে। আপনার রাঁধুনিকে যদি আজ রাখিয়া যান, তবে আমার বড় উপকার হয়।" বিপিনের মাতা সম্মত হইয়া কহিলেন, "সে কি মা, তোমার অসুখ-বিসুখ হইলে, শুধু রাঁধুনি কেন, আমরাও তোমার কাজ করিয়া দিব। এখন তবে যাই।"

বিপিনের মাতা প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিলে, সুরমা অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "চল ভাই, আমরা ছাতে যাই।" উভয়ে ছাতে চলিলেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ। সেই দৃশ্য দেখিয়া অন্নপূর্ণার মন যেন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

সুরমা বলিলেন, "ভাই, এ পর্য্যন্ত কথা বলিবার অবকাশ ঘটে নাই। এখন এস, এখানে বসিয়া তোমার অতীত-জীবনের কাহিনী শুনিব। আগে বল, তোমার নাম কি অন্নপূর্ণা?"

সুরমার মিষ্ট ব্যবহার অন্নপূর্ণার প্রাণ স্পর্শ করিল;—এমন ব্যবহার তিনি আর কোন রমণীর নিকট পান নাই। এমন লোকের কাছে তাঁহার আত্ম-কাহিনী বলিতে কোন আপত্তি হইল না। কিন্তু অপরিচিতার মুখে তিনি নিজনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন;—এখানে তো কেহ জানে না যে তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা? এখানে যে তিনি অন্য নামে পরিচিতা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিয়া জানিলেন যে আমার নাম অন্নপূর্ণা?"

সুরমা তাঁহার প্রার্থিত উত্তর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে 'আপনি' বলিও না ভাই, আমাকে তোমার সখী বলিয়া জানিও। তুমি আমায় চেন না বটে, কিন্তু আমরা তোমাকে চিনিয়াছি!"

বিস্মিতা হইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কেমন করিয়া চিনিলেন?"

সুরমা বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া প্রথমে সন্দেহ হয়। তারপর, আজ তোমার হাতের আংটীতে তোমার স্বামীর নাম দেখিয়া চিনিয়াছি;—বুঝিয়াছি, তুমি আমার স্বামীর বন্ধু সতীশ বাবুর জলমগ্না স্ত্রী অন্নপূর্ণা। আর তোমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে একটি তিল আছে, ইহাও তোমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলাম। এখন তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে এখানে আসিলে, তাহা জানিতে বড় আগ্রহ হইতেছে।"

অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিলেন, "পিতার সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী হইতে রওনা হইয়া যখন একটা বড় নদীর মাঝখানে আসিলাম, তখন হঠাৎ বানচা'ল হইয়া নৌকা ডুবিতে লাগিল। বাবা ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি সম্ভবতঃ ঘুমের ঘোরেই বলিয়া উঠিলেন, 'মা আমাকে ডাকৃছেন, আমি যাই।' নৌকা ডুবিল; বাবা চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই মা, ভগবান্ আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।'—শুনিতে শুনিতে ডুবিলাম। অল্প অল্প সাঁতার জানিতাম, কিন্তু সে প্রবল স্রোতে সাধ্য কি যে কূলের দিকে অগ্রসর হই? তখন একবার বাবার কথিত সেই পুরাণ পুরুষকে মনে পড়িল। তা'র পরে কি হইল, মনে নাই। যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম একজন প্রাচীনা আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ করুণ দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সংসারে তিনি এবং তাঁর স্বামী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁদের সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁ'রা আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই দেখিতেন। মায়ের স্নেহ যে কি বস্তু তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, এখানে আসিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিলাম। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম। আহা! সেই মায়ের

মত মা-ই বা ক'জনের ভাগ্যে মিলে! ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তিনি তোমাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন না কেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "একদিন মা তাহাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন যে আর পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার স্বামী-দর্শন ঘটিবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। আড়ালে থাকিয়া আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়াছিলাম, সুতরাং আমিও আর কিছু বলিনাই। তারপর চারিবৎসর পরে সে মাতাও আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। তিনি বড় সাধ্বী ছিলেন। তাঁর শোকে কিছু কাতর হইয়াছিলাম। পিতৃতুল্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। ক্রমে মন অনেকটা শান্ত হইল। শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। শেষ দিন নিকট জানিয়া তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দশ-বার দিন পূর্ব্বে আমরা ৺ কাশীধামে পৌছি।"

তৎপর তথা হইতে যে ভাবে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে অন্নপূর্ণা মুঙ্গের আসিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

(১৩)

এমন সময়ে বিনোদলাল বাড়ী আসিয়াছেন সাড়া পাইয়া সুরমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং স্বামীকে বলিলেন, "অনুমান সত্য। সতীশ বাবুকে আসিবার জন্য আজই তার কর, দেরী করিও না।"

বিনোদ সহাস্যে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন। শশব্যস্তে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদলাল তাঁহারই প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া আছেন। সতীশ বলিলেন, "তোমাকে তো ভাই সুস্থ শরীরে দেখিতেছি। তবে কি জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছ?"

বিনোদ সহাস্যে বলিলেন, "কেন আমাকে কি রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে চাও নাকি? না হয়, দু'দিন কালেজে অন্য কেহ তোমার পরিবর্ত্তে অধ্যাপনা করিবেন।" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে উভয়ে বাসায় আসিলেন।

বিনোদ ববিলেন, "ভাই, আর কতদিন বিবাহ না করিয়া থাকিবে? তোমাকে সংসারে একাকী ভাবিয়া আমার বড় কষ্ট হয়। তাই আমি পাত্রী

স্থির করিয়াছি, এবার তোমার ঘাড়ে চাপাইব। তুমি যাই বল, তোমার কথা আর শুনিব না। আমার কথা তোমাকে শুনিতেই হইবে।"

বিস্মিত সতীশ বলিলেন, "সে কি? এই জন্যই কি কারণ না জানাইয়া আসিতে বলিয়াছ? কিন্তু ভাই,"—

বিনোদ। আর কিন্তু-টিন্তু শুনিব না। এবার তোমাকে একাকী ছাড়িয়া দিব না।

সতীশ। একাকী কি ভাই? আমার কত ছেলে রহিয়াছে। তোমার মত বন্ধু আছে, ঘরে মা আছেন;—কেমন করিয়া একাকী হইলাম?

বিনোদ। বাজে কথায় কাজ নাই। এখন বল, কি প্রকার পাত্রী দেখিতে চাও? এখন তো নানারূপে পরীক্ষা করে, তুমি কি ভাবে পরীক্ষা করিবে?

সতীশ একটু বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংকল্প, দেশের এবং দশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন, আর বিবাহ করিবেন না। তাঁহার সে সঙ্কল্প বুঝি বিনোদ ঘুচাইয়া দিবে। মন খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন,—মন বিবাহে ইচ্ছুক নহে! এখনও অন্নপূর্ণার সেই মুখখানি সতীশ ভুলিতে পারেন নাই। এখনও তাহার আশা ছাড়েন নাই।

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "বলি, একেবারে নিরুত্তর যে? তবে আমি আমার পছন্দ মত পরীক্ষা করিব। আমার মতে স্ত্রীর হাতের রান্না না খেলে তৃপ্তি হয় না। সেই জন্য আমি বামুন রাখি না। তবে রান্না খেয়েই পরীক্ষা করা যা'ক।"

সতীশ কিছুই বলিলেন না। বিনোদের সকল কথা তাঁহার কাণে গিয়েছিল কিনা, সন্দেহ। এখনও তাঁহার পক্ষে অন্নপূর্ণা আছে। বিবাহ করিলে বুঝি আর আসিবে না! বিনোদ বন্ধুর মনের ভাব বুঝিলেন! তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিতে দেখিলেন, অন্নপূর্ণা অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছে;—চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে! বিনোদ পূর্ব্বে কখনও অন্নপূর্ণাকে দেখেন নাই। আজ দেখিয়া ভাবিলেন,—বাস্তবিক এ মুখ ভুলিবার নহে!

বিনোদ বাহিরে আসিয়া সতীশকে বলিলেন, "আর ভাবিলে কি হইবে? যাহা স্থির করিয়াছি তাহা করিতেই হইবে। এখন চল; নাইতে যাই।"

সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন। আর অন্নপূর্ণা? তাঁহার মন যে আজ কি করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন! তিনি সুরমার কাছে পূর্ব্বে সকল

কথা শুনিয়াছিলেন। তার পর স্বকর্ণে সতীশের কথা শুনিলেন। আনন্দে তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল!

সুরমা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুন্‌লে তো ভাই, তোমাকে আজ রাঁধ্‌তে হ'বে।" অন্নপূর্ণা রন্ধনশালে গেলেন। বাল্যাবধি তিনি রন্ধনে অভ্যস্তা ছিলেন, কিন্তু আজিকার মত এত আনন্দ তো আর কখনও হয় নাই! তাঁহার মন অনেক সময়েই অন্তর্জগতে ঘুরিয়া বেড়াইত, এ জন্য তিনি একটু অন্যমনস্কা ছিলেন। শৈলবালার কাছে কত সময়ে এ নিমিত্ত তিরস্কৃত হইয়াছেন। সেই মন যেন আজ বাহ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই অন্তর্নিবিষ্ট হইতে চাহিতেছে না। রন্ধনাদি শেষ হইল,—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুরমার আনন্দ যেন ধরিতেছে না! দুইটী সখী একত্র হইয়া বড় সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতে ও শুনিতে লাগিলেন। সকারণ, অকারণ, কতবার হাসিলেন, কতবার কাঁদিলেন!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, দুই বন্ধু আহারে বসিলেন। সুরমা বলিলেন, "ভাই অন্নপূর্ণা, আজ তোমার পরিবেশন কর্‌তে হ'বে।" অন্নপূর্ণা আজ আপত্তি করিলেন না।

(১৪)

সতীশকে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রান্না খেয়ে রাঁধুনীকে পছন্দ হ'বে তো? আমার কিন্তু খুব পছন্দ হ'চ্চে।"

সতীশ এবার হাসিয়া কহিলেন, "তবে আর কি? বৌদিদি শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন,—তা তুমিই না হয় বিয়ে কর। কুলীনের ঘরে বেমানান হবে না।"

পাতে ভাত নাই দেখিয়া অন্নপূর্ণা পুনর্ব্বার ভাত দিতে আসিলেন। সহসা তাঁহার অঙ্গুলির দিকে সতীশের চোখ পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। আহারান্তে বিনোদের বিশ্রামগৃহে বসিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ, ইনি কে?"

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "এখন কেন গো?

সতীশ। বলনা ভাই, তুমি কি বুঝিতেছ না আমার মন কি করিতেছে!

বিনোদ। কেন? দেখ্‌লেই তো চিন্‌তে পার্‌বে বলেছিলে?

সতীশ। আমি তো দেখি নাই, কিন্তু বল বিনোদ, এই কি সেই অন্নপূর্ণা?

বিনোদ। তোমার ভাবী স্ত্রী।

সতীশ। ঠাট্টা রাখ, বল ইঁহাকে কোথায় কি ভাবে পাইলে?

এবার বিনোদ যাহা যাহা জানিয়াছিলেন, সকলই সতীশকে বলিলেন। সতীশচন্দ্র স্থিরভাবে সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কোন প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। হৃদয়ের আনন্দের প্রতিবিম্ব তাঁহার নয়নদ্বয়ে প্রতিফলিত হইতেছিল।

এ দিকে সুরমা ও অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিলেন। সুরমা অন্নপূর্ণার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, ছাতে যাই।"

উভয়ে ছাতের উপর গিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন সুরমা কতকগুলি ফুল ও ফুলের মালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি ভাই ?"

সুরমা কহিলেন, "আজ তোমার যথার্থ বিবাহ। এই অনন্ত অসীম নীল-চন্দ্রাতপতলে অগ্নি-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সাক্ষী, তুমি আপনি আজ আত্মসমর্পণ করিবে। তাই আজ তোমাকে ফুলের সাজে সাজাইব।"

অন্নপূর্ণা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ফুট্‌ ফুটে জ্যোৎস্না তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার কাছে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যেন একাকার দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আত্ম-হারা হইয়া চির-মঙ্গলময়ের উদ্দেশে যুক্তকরে ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে নমস্কার করিলেন।

সুরমা ততক্ষণ অন্নপূর্ণাকে সাজাইতেছিলেন। ফুলের সাজে সজ্জিতা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সুরমার মনে হইতে লাগিল, আজ এই অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-বতীকে দেখিয়া সতীশবাবুর না জানি কত সুখ, কত আনন্দ হইবে! তাহা ভাবিয়াও আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে! প্রকাশ্যে অন্নপূর্ণাকে বলি-লেন, "ভাই, আমি তবে চলিলাম। সতীশবাবুকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

অন্নপূর্ণা স্থিরভাবে বসিয়া অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্ম যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র আসিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিনিমেষ নেত্রে সেই পবিত্রতা মাখা অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন —তাঁহার মনে হইতেছিল, মূর্ত্তিমতী সাধনা যেন ভগবানের আরাধনা করিতেছে। পরে ধীর পদবিক্ষেপে অন্নপূর্ণার সম্মুখে আসিলেন। আজ সামান্য পদশব্দে অন্নপূর্ণার ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধ্যানের দেবতা, —যাঁহাকে এতদিন মনে মনে পূজা করিয়াছেন,—ধ্যানে যাঁহার কল্পিত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—যে পাদপদ্ম দর্শনাশায় অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও বাঁচিতে সাধ হইয়াছে,—যাঁর স্মরণে আনন্দ, দর্শনে আনন্দ, সেই পরমানন্দময়

স্বামী,—তাঁহার সেই সারাৎসার পরাৎপর,—তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত রত্ন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার স্বামীর পাদমূলে নিপতিতা হইলেন, সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া অশ্রু বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—প্রভু এতদিনে কি দাসীর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে? তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

সুরমা অন্তরালে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল ভগবানের পাদপদ্মে যেন ভক্তি-কুসুম আপনাকে অর্পন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন! তাহার চক্ষে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল।

সতীশচন্দ্র সাদরে অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া স্নেহার্দ্র কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন —"এস আমার অন্নপূর্ণা! আমার আঁধার ঘরের আলো! এস আমার গৃহলক্ষ্মী! এখন আমার গৃহে চল।"

বাঙ্গালা ও তামিল উচ্চারণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

আমরা লিখি 'কাক,' বলি 'কাগ'; লিখি 'শাক,' বলি 'শাগ'; লিখি 'বক,' 'শকুন,' 'খাত,' 'পাক,' 'ছাত,' 'গাত,' 'শোক,'প্রভৃতি; কিন্তু বলি 'বগ,' 'শগুন,' 'খাদ' (যেমন 'স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি'), 'পাগ' ('গুড়ের পাগ'), 'গাদ' ('গরুটা গাদে পড়েছে'), 'শোগ' ('রোগে শোগে') প্রভৃতি। আবার সংস্কৃত 'কৃপা স্থানে প্রাকৃতে হয় 'কিবা,; 'ঋতু' স্থানে 'উদু,' 'রজত'স্থানে 'আঅদ', আগত স্থানে 'আঅদ', 'নিবৃত্তি' স্থানে 'নিব্বুদি', 'আকৃতি' স্থানে 'আইদি', 'সংযত' স্থানে 'সংজদ', 'শাপ' স্থানে 'সাব', 'শপথ' স্থানে 'সবহ', 'উলপ স্থানে 'উলব', 'উপসর্গ' স্থানে 'উবসগগ', 'কপাল' স্থানে 'কবাল', 'কোপ' স্থানে 'কোব', 'নট' স্থানে 'ণড়', 'বিটপ' স্থানে 'বিড়ব', 'কটু' স্থানে 'কড়ু', ইত্যাদি। সংস্কৃত 'কৃথ' ধাতু স্থানে প্রাকৃতে 'কঢ়', 'বেষ্ট' স্থানে 'বেঢ়', 'পত' স্থানে 'পড়', স্ফুট স্থানে 'ফুড়', 'পঠ', স্থানে 'পঢ়', ইত্যাদি। এই-সকল স্থানে অনাদি শ্বাসবর্ণ হয়; কিন্তু কারণ কি? হইলে স্বরবর্ণের পুঞ্জে শ্বাসবর্ণের

নাদবর্ণতা সংস্কৃতেরও নিয়ম ; যেমন দিগন্ত, বাগীশ। 'দ্বিকন্ত' বা বাকীশ' কি আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হইতে পারে না ?

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গোঁড়া ভক্ত যে হিন্দু বেদের ভাষা হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার উদ্ভব কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, যাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির অপূর্ব্ব কৌশলে সংস্কৃত 'পুস্তক' হইতে আরবী 'কিতাব' নিষ্পন্ন হয় *, তাঁহার নিকট আমার নিবেদন এই যে তিনি এ প্রবন্ধ পাঠ না করিলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা। কিন্তু যে সহিষ্ণু পাঠক স্বীকার করিতে পারেন যে দুই জাতি একত্র বাস করিলে উভয় জাতির ভাষা পরস্পরের ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের একত্র সম্পর্কে উর্দ্দুর ন্যায় মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইতে পারে, ইরাণীয় ও সেমিতীয় জাতির একত্রনিবন্ধন আধুনিক পারস্য ভাষা প্রসূত হইতে পারে, ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলনে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা পরস্পর প্রভাবান্বিত হইতে পারে, তিনি বিচার করিয়া দেখিলে আশ্বস্ত হইবেন যে যে আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে একত্র হইবার পর আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের আধুনিক ভাষাসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দ্রাবিড়জাতিসমূহের ভাষায় এমন একটা উচ্চারণ নিয়ম প্রচলিত আছে যাহা আমাদের এই উচ্চারণের অনুরূপ। দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এই ভাষার বর্ণমালায় স্পর্শ বর্ণের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রতি বর্গে দুইটি বর্ণ ;—প্রথম বর্ণ ও পঞ্চম বর্ণ। অন্য বর্ণের আবশ্যকতা ইহাদের হয় নাই। মহাপ্রাণ বর্ণ ইহাদের নাই ; উচ্চারণেও নাই, লিপিতেও নাই। কিন্তু শ্বাসবর্ণ ও নাদবর্ণ উভয়েরই উচ্চারণ থাকিলেও লিখিবার সময় বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। কারণ ইঁহাদের উচ্চারণ প্রণালীতে এমন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে যে তাহাতে এক বর্ণের দ্বারা দ্বিবিধ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না। ইঁহাদের সেই বিধিটা এই :—

"তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনাদি অযুক্ত শ্বাসবর্ণের উচ্চারণ নাদবর্ণের ন্যায় হয় ; কোনও বর্ণ দ্বিগুণিত হইলে তাহার শ্বাস উচ্চারণ হয় ; পদাদিতে দ্বিগুণিত বর্ণ থাকে না।"

---

* আরবেরা দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখে বলিয়া সংস্কৃত 'পুস্তক' ইহারা 'কতপু' পড়িয়াছে ; এবং ইহাদের ভাষায় স্বরবর্ণের নিতান্ত বিশৃঙ্খলতাবশতঃ 'কতপু' স্থানে 'কিতাপ' বা 'কিতাব' হইয়াছে।

এই বিধি এত প্রবল যে সংস্কৃত, ইংরাজী বা অন্য কোনও ভাষার শব্দ তামিল ভাষায় গৃহীত হইলে এই বিধির অনুরূপ তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। সংস্কৃত 'দন্ত' শব্দ তামিল ভাষায় লিখিত হইবে 'তন্তম্', পঠিত হইবে 'তন্দম্'। সংস্কৃত 'ভাগ্য' লিখিত ও পঠিত হইবে, 'পাক্কিয়ম্'।

এসিয়া ও ইউরোপের আধুনিক বা প্রাচীন আর্য্যভাষাসমূহে এ-প্রকার বর্ণব্যত্যয়ের বিধি নাই। তবে এরূপ উচ্চারণ তামিল ভাষায় আসিল কি প্রকারে? যদি ভারতবর্ষে এই উচ্চারণ প্রথম উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে সংস্কৃত হইতে তামিলে এ উচ্চারণের সংক্রমণ যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় না কিন্তু সংস্কৃত যেরূপ রক্ষণশীল ভাষা তাহাতে অন্যান্য আর্য্যভাষায় যে বিধির কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না এরূপ বিধি সংস্কৃতে থাকিলে বলিতেই হইবে যে সে-সকল দ্রাবিড় দস্যু (বা ভবিষ্যতে শূদ্রত্বে উন্নীত) জাতির সহিত আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে শত্রুভাবেই হউক আর মিত্রভাবেই হউক মিশিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান আবশ্যক হওয়ায় তাহাদিগের পক্ষে যেমন সংস্কৃতবহুল ভাষার ব্যবহার অপরিত্যাজ্য হইয়াছিল, আর্য্যগণের পক্ষেও সেইরূপ দ্রাবিড়ী ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এবং এই প্রভাবই সংস্কৃত ভাষার উপর বহিঃপ্রভাব। এই প্রভাবই সংস্কৃতের পক্ষে অন্যান্য আর্য্যভাষায় অপ্রাপ্য বিশিষ্টতার হেতু। হিব্রু-ভাষায় ব, গ, দ ও ক, ফ, থ, বর্ণের পরিবর্ত্তন কতকটা তামিল ভাষার এই পরিবর্ত্তনের অনুরূপ। হিব্রুর Be GaD ও Ke PHa TH বর্ণসমূহের স্থান বিশেষে দ্বিবিধ উচ্চারণ হয়। সে বিষয়ে আমরা অধিক আলোচনা করিব না। কারণ হিব্রুর নিয়মও তামিলের নিয়মে সম্পূর্ণ অনৈক্য নাই, অনুরূপতা মাত্র আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের ভাষার ন্যায় হিব্রু বহিঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তামিল ভাষার সহিত যে সকল ইউরোপীয় সংযোগধর্ম্মী (agglutinative) ভাষার সবিশেষ সম্পর্ক আছে সেই সকল ভাষার কোনও-কোনও-টীতে অর্থাৎ লাপলাণ্ড ও ফিনলাণ্ডের দুইটী ভাষায় এবিষয়ে উচ্চারণ বিষয়ক বিধি সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন পদাদি বা অক্ষরাদিতে (beginning of a syllable) এই দুই ভাষায় (Finnish and Lappish) নাদ বর্ণের ব্যবহার কুত্রাপি নাই। ইরাণ দেশীও বেহিস্তন-লিপিতে শক-ভাষার যে প্রাচীন আদর্শ সংরক্ষিত আছে তাহাতে পদাদিতে কেবলমাত্র শ্বাসবর্ণ ও অন্তত্র কেবলমাত্র নাদবর্ণের ব্যবহার হয় কিন্তু অনাদিবর্ণ দ্বিগুণিত হইলে

তাহার নাদ উচ্চারণ হয় না, শ্বাস উচ্চারণ হয়*। টিউটনিক ভাষায় গ্রীক-কৃত বিধির কোনও কোনও স্থানে অনুরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। যেমন 'দ্বি' বা 'দ্ব' স্থানে 'two', 'দন্ত' স্থানে 'tooth' 'দ্রু' স্থানে 'tree' 'দশন্' স্থানে 'ten' 'ধিত' বা 'হিত' স্থানে deed, শ্রুত স্থানে 'loud' ইত্যাদি। টিউটনিক ভাষার এই বর্ণ পরিবর্ত্তন বা Sound shifting বিধিও অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় নাই ; সুতরাং এটীও খাপ-ছাড়া নিয়ম। এ বিষয়ে গ্রীম-ভার্ণার-ব্রুগ্‌মান্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের ঐন্দ্রজালিক বচনকে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার কাল অতীত হইয়াছে। কোন্ বৈদেশিক ভাষার সংস্পর্শে এ ভাষার এ প্রকার পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে।

প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ পালঘাটনিবাসী শ্রীরামচন্দ্র নায়ার নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত সবিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত ভাষা বেশ জানিতেন এবং অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন ; কিন্তু না-হিন্দি না-ইংরাজী না-বাঙ্গালা কোনও ভাষাই জানিতেন না। অথচ এ অঞ্চলে আসিয়া তিন ভাষাই শিখিতেছিলেন এবং তিন ভাষার মিশ্রণে এবং সময়ে সময়ে সংস্কৃত ভাষারই সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিতেন। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং এ দেশে (দারভাঙ্গা ও কলিকাতায়) ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় শ্রীযুক্তকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ইঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই। ইনি বাঙ্গালা বলিবার সময় সংস্কৃতের অনুবাদ চেষ্টায় এ প্রকার অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিতেন যে তাহাদের ভাষার প্রকৃতি (morpholgy) ও আমাদের ভাষার শব্দ মিলিয়া এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী প্রস্তুত হইত। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "কামাখ্যানাথ পণ্ডিত কেমন পড়াইতেছেন?" তিনি তাহার উত্তর দিলেন "পণ্ডিত কামাখ্যানাথ অভিমানী (গর্ব্বিত) আছেন, কিন্তু পঠিবার (পড়িবার) নিমিত্ত সময়ে (অধ্যয়ন দশায়) তাহাতে আমাদের কোনো দোষ (ক্ষতি)

---

*আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাতেও কোনও কোনও স্থানে এ প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। সংস্কৃত 'ব্রজতি' স্থানে প্রা 'বচ্চই'. 'গৃহ্লাতি' 'গৃভ্‌ণাতি' স্থানে প্রা 'ঘেপ্পই' 'বদতি', স্থানে 'বোচ্চই', স 'উৎঘোষমান স্থানে পৈশাচী 'উক্‌খোসমান', 'নষ্ট্বা' স্থানে পৈশাচী 'নৎথূন', ইত্যাদি প্রাকৃতে যুক্তবর্ণের একটার লোপ ও শেষভূতটার দ্বিত্ব তামিল ভাষার উচ্চারণের অনুরূপ।

নাই।" সংস্কৃত প্রত্যয়ের প্রভাবে এক 'পঠনায়' পদদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় তাহার জন্য ইনি একটি অতিরিক্ত 'নিমিত্ত' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ ইঁহাদের ভাষা সংযোগধর্ম্মী বা সমাসধর্ম্মী (agglutinative), অর্থাৎ এক একটী শব্দ ইঁহাদের প্রত্যয়ের কার্য্য করে, আবার আবশ্যক হইলে সেই প্রত্যয় স্থানীয় শব্দটার স্বাধীন ব্যবহারও হইতে পারে। স্বাধীন ব্যবহার সর্ব্বত্র না হইলেও তাহাদের এক একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে ; সংস্কৃতে তাহা নাই। এই জন্য নিজের ভাষার প্রভাবে প্রত্যয়ের পরে প্রত্যয়ের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য ইনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষার রীতির বিরুদ্ধে একটী অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ-সংস্কৃত 'পঠ' ধাতু অবিকল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিয়া ফেলিলেন! কারণ 'পঠ' ধাতু স্থানে 'পড়' উচ্চারণ তাঁহার নিজের ভাষাতেই হয় বলিয়া প্রাদেশিকতা পরিহার কল্পে সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখা আবশ্যক মনে করিলেন! এই সামান্য উদাহরণ যাহা দেখা গেল সেই ভাবেই দুই দুই ভাষার মিলন ও পরস্পর প্রভাব বিস্তার চলে। সং 'পঠ' উচ্চারণ করিতে আমরা অসমর্থ নহি, কিন্তু তথাপি 'পড়' উচ্চারণ আমাদের সংস্কারের সহিত মিশিয়া গেল কি প্রকারে? এ সেই অতি প্রাচীন কালের দ্রাবিড়ীয় সম্পর্ক, সেই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বর্ণিত বানরগণের প্রভাব, সেই অগস্ত্যপ্রবর্ত্তিত বিন্ধ্যশৈলের দর্পহরণের ফল স্বরূপ আমাদের ভাষায়, তথা সংস্কৃত ও বেদের ভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। নতুবা মীমাংসাচার্য্য জৈমিনি, ভাষ্যকার শবরস্বামী ও টীকাকার কুমারিল ভট্ট বেদে ম্লেচ্ছ শব্দ বা (দ্রাবিড়ীয় শব্দ) দেখিতে পাইতেন না এবং তাহাদের তত্তদ্দেশ প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

আমাদের ট-বর্গের উচ্চারণের জন্যও আমরা দ্রাবিড়ীয়গণের নিকট ঋণী। মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ আর্য্যভাষায় প্রাচীন নহে। ইংরাজী ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাসমূহেও এই টবর্গের উচ্চারণ নাই। এমনকি পারস্যের ভাষায় এ উচ্চারণ নাই এবং কোনও কালে ছিল না। ইংলণ্ডের t ও d বর্ণের উচ্চারণ না-দন্ত্য না-মূর্দ্ধণ্য। কিন্তু আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে এরূপ উচ্চারণ হয় না এবং আমাদের কাণে ওরূপ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। সে যাহাই হউক ইংলণ্ডের উচ্চারণ ও বহিঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু এ কথা খাঁটি যে ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্কের বহু পূর্ব্বেই আমাদের ভাষায় ট-বর্গের উচ্চারণ স্থান পাইয়াছে এবং আমাদের বেদে এই উচ্চারণ আছে। সুতরাং ইংলণ্ডের প্রভাব

এটা নহে। আমি মনে করি এ উচ্চারণ প্রাচীন দ্রাবিড়ীয়ভাষা হইতে প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় সংক্রমিত হইয়াছে। এ ধারণার পক্ষে প্রধান হেতুরূপে নির্দ্দেষ করা যায় :—

(১) তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষার বহু ধাতুতে দন্ত্যবর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ভেদ সহ অর্থ ভেদ আছে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মুর্দ্ধণ্য বর্ণের সে প্রকার ব্যবহার হয় নাই। সংস্কৃতে দন্ত্য বর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণে (বিশেষত্ব ন ও ণকারে) প্রভেদ কেবলমাত্র স্থিতি জন্য; অর্থ জন্ম নহে। ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণের পরবর্ত্তী দন্ত নকারই মূর্দ্ধণ্য নকারে পরিণত হয়।

(২) সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট ইউরোপ ও এসিয়ার অন্যান্য আর্য্য-ভাষা সমূহের কোনওটাতেই ট বর্গ নাই। গ্রীক ভাষায় নাই, লাটিন ভাষায় নাই গথিক, কেল্‌টিক, লিথুআলীয় শ্লাবনীয় বা প্রাচীন ও আধুনিক পারস্য ভাষায় নাই। উর্দ্দু ভাষায় ট ড প্রভৃতি লিখিবার জন্য নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় ট বর্গ আছে। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষায় আছে। প্রকৃত ভাষায় ট বর্গীয় বর্ণসমূহের সমধিক ব্যবহার করিয়াছে*।

(৩) সংস্কৃত শব্দ দ্রাবিড়ীয় ভাষায় গৃহীত হইলে তাহার উচ্চারণের সংস্কার বিনাব্যতিরেকে হইয়া থাকে। তামিলভাষিগণ প্রথমে সংস্কৃত শব্দকে তামিলভাষার অনুরূপ উচ্চারণে পরিবর্ত্তিত করিবেন পরে সে শব্দের তামিল ভাষায় ব্যবহার করিবেন। সংস্কৃতের অনুরূপ উচ্চারণ তাঁহারা কোনও কালেই করেন নাই ও করেন না। এজন্য সংস্কৃতের কোনও মহাপ্রাণ বর্ণ তামিল ভাষায় স্থান পায় নাই। এমন কি সংস্কৃত উষ্মবর্ণ মূর্দ্ধণ্য ষ তামিল ভাষায় নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে তামিল ভাষায় ট বর্গের উচ্চারণ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

---

* বেদের ভাষায় যে মুর্দ্ধণ্য ছিল, পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তাহার পরিহার হইয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহে মূর্দ্ধণ্য কারের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে। সংস্কৃত শব্দ কানারিজ্‌ বা মালয়ালম্‌ ভাষায় গৃহীত হইলে তাহার মূর্দ্ধণ্য ফুটিয়া উঠিবে—সংস্কৃত শব্দে সে থাকুক আর নাই থাকুক। তামিল ও তেলেগু ভাষায় ণ বর্ণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। মহারাষ্ট্রী ও কঙ্কণী ভাষা আর্য্য ভাষা হইলেও বৈদিক ণ কারের সমাদর বজায় রাখিয়াছে। অথচ আর্য্যাবর্ত্তের অন্য কোনও ভাষা এ ণ উচ্চারণ করিতে হয় অসমর্থ, না হয় অসম্মত।

(৪) তেলেগু ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে সমধিক প্রভাবান্বিত হইলেও তামিল অপেক্ষা তেলেগু ভাষায় মূৰ্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তামিল ভাষাতেই মূৰ্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার অধিক।

(৫) বেহিস্তনের ফলকলিপিতে যে শকভাষায় প্রাচীন আদর্শ সংগৃহীত আছে তাহাতে ট বর্গীয় বর্ণসমূহের সত্তা দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ফিন্‌লাণ্ড, লাপ্‌লাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অনার্য্য শকভাষায় যে মূৰ্দ্ধণ্য বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাই বেহিস্তন লিপি ও ব্রাহুই ভাষার মধ্য দিয়া দ্রাবিড়ীয় ভাষায় গিয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে এ উচ্চারণ শকভাষার বৈশিষ্ট্য, এবং শকভাষাসমূহ বা ফিন্‌লাণ্ড লাপলাণ্ড, তুর্কী, হাঙ্গারী, সাইবিরিয়া মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে যে সমাসধর্ম্মী (agglutinating) ভাষাসমূহ পরিদৃষ্ট হয় দ্রাবিড়ীভাষাও সেই শ্রেণীর ভাষা এবং এই সকল ভাষার সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার সবিশেষ সম্পর্ক আছে। সুতরাং এ উচ্চারণ এই সকল ভাষাতেই মৌলিক ভাবে সমুদ্ভূত।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতদিগের নানা মুনির নানা মত। সুতরাং সেই সকল মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। বেন্‌ফি বলিয়াছেন, "মূৰ্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ সমূহের উচ্চারণ সম্ভবতঃ ভারতের প্রাচীন অনার্য্য আদিমনিবাসিগণের বর্ণমালা হইতে সংস্কৃতের বর্ণমালায় আসিয়াছে, এবং সংস্কৃতে তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" * বেন্‌ফি সাহেবের এমত নিতান্তই সম্ভাবনামূলক; ইহাতে কোনও বিশেষ যুক্তির অবতারণা হয় নাই। সুতরাং ইহার তেমন মূল্য নাই। বুলর (Buhler) সাহেব যুক্তিসহ প্রতিকূল মত দিয়াছেন। ঋ, র, ও ষ মূৰ্দ্ধণ্য বর্ণ, এবং ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও ইরাণীয় জেন্দ্‌ভাষায় এই তিনটী বর্ণই আছে। ইউরোপীয় ভাষায় ষ না থাকিলেও 'sh' উচ্চারণ আছে। আবার তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় মূৰ্দ্ধণ্য ষ নাই। ঋ এবং র আর্য্য ভাষার মৌলিক উচ্চারণ। সংস্কৃত ভাষায় এই ঋ, র বা ষ এর প্রভাবেই মূৰ্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বুলর্ বলেন যে সংস্কৃতে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ব্যতিরেকেই স্বাধীন ভাবে ট বর্গীয় উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মতে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ী উভয় ভাষাতেই স্বাধীনভাবে পৃথক পৃথক কারণে মূৰ্দ্ধণ্য

* "The mute cerebrals have probably been introduced from the phonetic system of the Indian aborigines into Sanskrit, in which, however, they have become firmly established"—Muir's Sanskrit Texts vol II. 460.

স্পর্শবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে উভয় ভাষাই পরস্পরের প্রভাব নিরপেক্ষ। স্বাধীন সৃষ্টির উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে টিউটনিক (বিশেষতঃ ইংরাজী) ও স্লাবনিক ভাষায়ও মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের সত্তা আছে, ব্যাকরণে থাকুক আর নাই থাকুক। উইল্‌সনের সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে তিনি একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া * বলিতে চাহেন যে উইল্‌সন ইংরাজী ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের সত্তা দেখিয়াছেন। সুতরাং বুলরের মতে স্বাধীনভাবে যখন একটী আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তবে অপর আর একটী ভাষায় তাহা না হইবে কেন? তিনি আরও বলেন যে পর-ভাষার উচ্চারণ গ্রহণ করা কোনও ভাষাতেই দেখা যায় নাই এবং সে প্রকার পর প্রভাবের কোনও মতবাদ এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। * সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব স্বীকার করিবার হেতু নাই।

বুলারের কথায় ঋ, র ও য বর্ণের প্রভাবে যখন মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উৎপত্তি হয় তখন ইহাকে তিনি অন্য-নিরপেক্ষ উৎপত্তি বলেন কি প্রকারে? দ্রাবিড়ী ভাষায় অন্য নিরপেক্ষ ভাবে এই সকল বর্ণের সত্তা এবং দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভেদে অর্থের প্রভেদ যেরূপভাবে হয়, তাহাতে দ্রাবিড়ী মূর্দ্ধণ্য বর্ণ

---

* The Sanskrit consonants are generally pronounced as in English, and we have, it may be suspected, several of the sounds of which the Sanskrit alphabet has provided distinct signs. This seems to be the case with the *cerebrals.* We write but one *t* and one *d*, but their sounds differ in such words as *trumpet* and *tongue*, *drain* and *den*, in the first of which they are *cerebrals*, in the second *dentals*.—H. H. Wilson, Sanskrit Grammar, p 3.

* The possibility of borrowing of sounds by one language from another has never as yet been proved. * *. Comparative philologists have admitted loan – Theories too easily, without examining facts. * * *. Regarding the borrowing of sounds it may suffice for the present to remark that it has never been shown to occur in the languages which were influenced by others in historical times, such as English, Spanish and the other Romance languages, Persian, etc. * * * We find still stronger evidence against the loan-theory in the well-known fact that nations which, like the Jews, the Parsees, the Slavonian tribes of Germany, the Irish, etc. have lost their mother-tongue, are, as nations, unable to adopt with the words and grammatical laws also the pronunciation of the foreign language.—Madras Journal of Literature 1864, pp 116-136, in an article contributed by Dr. Buhler.

স্বাধীনভাবে উদ্ভূত, অথবা সংস্কৃত অপেক্ষা অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত এ কথা স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু যে ভাষায় এই উচ্চারণ সাধারণতঃ এই উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট অন্য বর্ণের সম্পর্কে জাত হয়, তাহাকে অন্য নিরপেক্ষ বলা যায় না! যে উচ্চারণ তোমার পরিচিত সেই উচ্চারণের সহায়তাতেই অপরিচিত উচ্চারণ লক্ষিত করা সম্ভব-পর। তাই সংস্কৃতে ঋকারাদি বর্ণের সাহচর্য্যে এবং ইংরাজী trumpet, drain প্রভৃতি শব্দেরও ণ বর্ণের সম্পর্কে মূর্দ্ধণ্য স্পর্শ বর্ণ লক্ষিত করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কোণ, কুণি, গণ, গুণ, পণ, পণ্য, বণিক্, প্রভৃতি বহু শব্দে স্বাধীন মূর্দ্ধণ্য ণ (ব্যাকরণের স্বাভাবিক ণ) দৃষ্ট হয়। কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় র বর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ ও ল বর্ণের দ্বিবিধ উচ্চারণ এবং যাবতীয় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের স্বাধীন উচ্চারণ (অবশ্য মহাপ্রাণ বর্ণ বা উষ্ম বর্ণ নাই), প্রভৃতি কারণে এবং অতি দূরদেশবর্ত্তী ভাষা সমূহের সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার সম্পর্ক এবং সে সকল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের সত্তা প্রভৃতি কারণে বলিতে হয় যে দ্রাবিড়ী ভাষায় বা যে ভাষা হইতে দ্রাবিড়ী ভাষা সমুদ্ভূত সেই প্রাচীন ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণে উচ্চারণ অতি প্রাচীন ; এবং বহু-কাল একত্র নিবাস হেতু সংস্কৃত ভাষায় এ উচ্চারণ সংক্রমিত হইয়াছে!

তামিল ভাষায় দন্ত ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভেদ-প্রদর্শক কয়েকটী শব্দ :—

কুদি — উল্লম্ফন কুড়ি — পানকরা	কোত্তু — খনন করা কোট্টু — ঢাক বাজান
পুদেই — আচ্ছাদন বা গোপন করা পুড়েই — সরা অপসরণ	অরি — চর্ব্বণ করা অরি́ — জানা অ়ি = বিনাশ করা
এন্ — বলা এণ্ — গণা	অরু — বিরল হওয়া অরু́ — কাটিয়া ফেলা অ়ু — অশ্রুত্যাগ করা, রোদন করা
মনেই = গৃহ মণেই — বিষ্ঠা	কোল্ — হত্যা করা কোণ্ গ্রহণ করা
কত্তু — শব্দ করা কট্টু — বাঁধা	তুলেই = শেষ করা তুণেই = ছিদ্র করা *

* Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian Languages, 2nd Edition, 1875, pp 37-38.

ইংরাজী ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শ বর্ণের অন্য-নিরপেক্ষ ব্যুৎপত্তির কথা যাহা বুলর বলিয়াছেন তাহার উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে অন্য-নিরপেক্ষ নহে। টিউনিক ভাষায় গ্রীমের আবিষ্কৃত ঐন্দ্রজালিক ধ্বনি পরিবর্ত্তনের বিধির ন্যায় এস্থলেও প্রকৃত কারণ নির্ণয় বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। লাপলাণ্ডের ভাষা হইতে স্কান্দিনেবিয়ার মধ্য দিয়া নর্মানগণ তাহাদের এ উচ্চারণ পাইয়াছে কিনা কে জানে? ইংরাজী উচ্চারণ যে দক্ষিণ-ই উরোপের উচ্চারণ হইতে (এমন কি ফরাসী ও জর্ম্মণ হইতে) বিভিন্ন এবং ভারতবর্ষের দন্ত্য বর্ণ অপেক্ষা মূর্দ্ধণ্য বর্ণের অধিক সন্নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। r বর্ণ পূর্ব্বে থাকিলে t, d বা n বর্ণের সম্পূর্ণ মূর্দ্ধণ্যতা প্রাপ্তি ঘটে। যেমন mart, yard, barn : এই সকল স্থলে মূর্দ্ধ্যতা trumpet ও drain অপেক্ষা অধিক। ণ-বর্ণের সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক ইংরাজী t ও d বর্ণের উচ্চারণ আমাদের নিকট মূর্দ্ধণ্য। Director শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে হইবে 'ডিরেকৃটর' ('দিরেকৃতর্' নহে)।

আর একটা কথা উঠিয়াছে, উচ্চারণ বিষয়ে কোনও ভাষায় পরপ্রভাব প্রমাণিত হয় নাই। বুলরের সে যুগে এটা অপ্রমাণিত থাকিলেও এ যুগে প্রমাণিত হইয়াছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই অন্য জাতির ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তান হিন্দু, উর্দ্দু ও বাঙ্গলা সমভাবে শিখে এবং তিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়। কল্ড্‌ওয়েল (Bishop Caldwell) বুলরের কথার একটু ঘুরাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। বুলর বলেন ইংরাজী ভাষায় নর্মানদিগের আগমনের পর নর্মান প্রভাবে ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী সাক্‌সানদিগের ভাষায় শব্দসম্পদ ও প্রত্যয়াদি বিষয়ে ভূয়ান্ পরিবর্ত্তন হওয়াসত্বেও উচ্চারণ-গত কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং সাক্‌সানেরা ফরাসী a বা u উচ্চারণ করিতেও শিখে নাই। ইহা হইতেই বুলার প্রমাণ করিতে চাহেন যে উচ্চারণ প্রণালী এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু তিনি একথা ভুলিয়া গেলেন যে নর্মানেরা সাকসানদিকের উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছে। স্কান্দিনেবিয়া বা উত্তর দেশ হইতে আসিয়া নর্মানেরা (Northmen) ফ্রান্সে দুই শতাব্দীমাত্র বাস করিয়া ফরাসী উচ্চারণ গ্রহণ করে এবং তাহার পরে ইংলণ্ডে যাইয়া আবার সেখানকার উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা পর প্রভাবের উজ্জ্বল উদাহরণ আর কি হইতে পারে? বুলরের যুক্তি গ্রহণ করিলে তাঁহারই কথায় তাঁহাকে বলা যায় যে যেমন করিয়া নর্মানেরা ইংলণ্ডে আসিয়া সাকসানদিগের উচ্চারণ প্রণালী

গ্রহণ করে, সেই প্রকারেই আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। Caldwell আফ্রিকার ভাষা হইতে পরপ্রভাবের আরও অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না।

গৌড়ীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণ লেখক বিম্‌স্ এ বিষয়ে একটী অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়া বুলরের মতের প্রায় সমর্থন করিয়াছেন। তিনি জলবায়ুর প্রভাবে উচ্চারণ প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া ভারতবর্ষে অন্তনিরপেক্ষভাবে সংস্কৃতভাষায় ট বর্গের উচ্চারণ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া দীর্ঘ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের একালপর্য্যন্ত যে চর্চ্চা হইয়াছে তাহাতে ভাষা বা উচ্চারণের উপর জলবায়ুর প্রভাব স্বীকৃত হয় নাই। তবে এ বিষয়ে আলোচনাও নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু একথা খাঁটি সত্য যে ভারতে আর্য্য ও দ্রাবিড় উভয় জাতিই দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ সমূহের সমভাবে উচ্চারণ করিতে সমর্থ। জলবায়ুর কোনও প্রভাব এদেশে স্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। বাগ্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালীগত কোনও বিশেষ প্রভেদ আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে নাই।

অতঃপর উষ্মবর্ণের কথা। তামিল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষকারের উচ্চারণ নাই একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দন্ত্য সকার ও ইহাদের ভাষায় নাই। চ বা তালব্য শ লিখিবার একমাত্র অক্ষর। ইহার দ্বিত্ব হইলে 'চ্চ' হয়, একক থাকিলে 'শ' হয়। সংস্কৃতের প্রভাবে এক্ষণে শ, য ও স তিন বর্ণই দ্রাবিড়ী ভাষায় স্থান পাইতেছে এবং 'গ্রন্থ' অক্ষর ব্যবহৃত হইতেছে।

আর্য্যভাষাসমূহের উচ্চারণের ক্রমভেদে দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে ;—কেণ্টুম্ (Centum) ভাষাসমূহ ও শতেম্ (Satem) ভাষাসমূহ। এই দুই শ্রেণীর প্রথমগুলিতে মৌলিক তালব্য ক (*K) বর্ণের 'ক' উচ্চারণ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'শ' উচ্চারণ হয়। এ উচ্চারণের বিভিন্নতার কারণ নির্ণয় চেষ্টা হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু কারণ নির্ণয় চেষ্টা করিলে তাহা যে ফল প্রসব করিতে পারে না ইহা মনে করি না। কারণ যে সকল ভাষায় শ উচ্চারণ দেখা যায়, সেই সকল ভাষা শক ভাষাসমূহের নিকটবর্ত্তী। এবং কেবলমাত্র নবাবিষ্কৃত তুখারীয় (Tokharian) ভাষা ভিন্ন অন্য যে সকল ভাষায় 'ক' উচ্চারণ হয়, সে সকল ভাষা শক ভাষাসমূহ হইতে বহু দূরবর্ত্তী। আমার মনে হয় যে মূল ভাষা হইতে দ্রাবিড়ী ভাষা সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই ভাষাতে এই

উচ্চারণ ছিল এবং সেই জন্যই তামিল ভাষায় এ উচ্চারণ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'শতম্' ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায় 'satom' (শতম্), লিথো শ্লাবনীয় 'szimtas' প্রভৃতি 'শ' বা উষ্ম বর্ণের উচ্চারণ এবং গ্রীক '(he) katon' (হেকাটোন্), লাটিন 'Centum' (কেণ্টুম্), কেল্টিক cet (from 'Kent') গথিক 'hund' (এখানে 'ক' স্থানে 'খ' বা 'হ' হইয়াছে, Grimm's Law) তুখারীয় 'Kandh' প্রভৃতিতে 'ক' উচ্চারণ হইয়া থাকে। সংস্কৃত 'দশন্' (=১০), জেন্দ্ 'দশ', আর্মিনীয় 'tasn', গ্রীক 'deka', লাটিন 'decem' ('dekem'), প্রাচীন আইরিশ্ dech ইত্যাদি। এই সকল ভাষায় 'ক' ও 'শ' উচ্চারণ যে গোলযোগ দেখা যায় দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহেও তাহা লক্ষিত হয়। কানারিজ 'কিন্ন' (=ক্ষুদ্র) স্থানে তামিল 'শিন্ন' কানারিজ 'কিবি' (শ্রবণেন্দ্রিয়) স্থানে তামিল 'শেবি' কানারিজ 'গেয়্' ('কেই', করা) স্থানে তামিল 'শেয়্'।

সস্কৃত 'অম্ল' স্থানে বাঙ্গালায় 'অম্বল' উচ্চারণ করিয়া আমরা উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ একটী অতিরিক্ত 'ব' আনিয়া ফেলি, তামিল ভাষায় উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ অনুনাসিক বর্ণের সহিত এই প্রকার সহায়ক বর্ণের উচ্চারণ বিরল নহে। সংস্কৃত 'গোধূম' শব্দের তামিল উচ্চারণ 'কোদ্বুম্বেই'। এ উচ্চারণকে ভাষাবিশেষের সম্পত্তি বলা যায় না, কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষিত হয়। সংস্কৃত 'স্বনঃ', লাটিন 'sonus' ইংরাজীতে sound কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় সময়ে সময়ে এই উচ্চারণের একমাত্র অতি-পরিণতি দেখা যায়; এ স্থানে সময়ে সময়ে অনুনাসিক অংশ লোপ পাইয়া 'ম' স্থানে 'ব' হয়। অমাদের বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে 'নামা' স্থানে 'নাবা', 'তামা' স্থানে 'তাঁবা', 'আম' স্থানে 'আঁব' প্রভৃতির উচ্চারণের নিন্দা করিয়া অন্য স্থানের অধিবাসীরা অনেক সময় 'মামা' শব্দের 'ম' স্থানে 'ব' উচ্চারণ করিলে যে অর্থ বিকৃতি ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানিয়া রাখুন তামিল ভাষায় 'মামন্' (='মামা') এবং 'মামি' (=মামী) শব্দের 'ম' স্থানে কুর্গী ভাষায় 'ব' হয়; তবে উভয়ত্র নহে, প্রথম মকার ঠিক থাকে। তামিল 'মামন্' (=শ্বশুর)—কুর্গী 'মাবু', তামিল 'মামি' (=শ্বশ্রূ)—কুর্গী 'মাবি'। তামিল ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় এবং প্রাদেশিক তামিল ভাষায় এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

স্থানে স্থানে অনুনাসিকের লোপ করা যেমন দ্রাবিড়ী ভাষার একটী লক্ষণ, স্থানে স্থানে অতিরিক্ত অনুনাসিকতাও এ ভাষার সেইরূপ একটী বৈশিষ্ট্য। তামিল ভাষায় ইহার অসংখ্য উদাহরণ—'ন্দু' (বা 'ণ্ডু') প্রত্যয় যোগে—